আমরা বাঙ্গালী

অধ্যাপক

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ.

প্রণীত

পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

এ. মুখাৰ্জ্জী এণ্ড কোং : কলিকাতা

Published by :
A. R. Mukherjee
2, College Square, Calcutta

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি—"

—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য চতুর্থ সংস্করণের
বর্দ্ধিত মূল্য দুই টাকা করা হইল।

Printed by N. Mukherjee from 1, Muktaram Babu Street at Emerald Printing from Page 1 to 96 and the rest by J. C. Sarkhel at the Calcutta Oriental Press Ltd., 9, Panchanan Ghose Lane.

আমরা—

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী, অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।
বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিদান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙ্গালার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাসন করি
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে—'ওঙ্কার-ধাম,'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদের কোন্ স্থপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।

* * * *

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

* * * *

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়াছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

* * * *

মণি অতুলন ছিল যে গোপন স্বজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষী ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

এই বইখানির অধিকাংশ ভাগই সঙ্কলন মাত্র, তথাপি প্রত্যেক বিষয়ে আমার মতামত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল মনীষীর গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অভিভাষণ প্রভৃতি অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব, তথাপি ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বিমলাচরণ লাহা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্রনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাঃ ষ্টেলা ক্রমরিশ, সুধীর রায় ও অপর্ণা দেবী, অসিত হালদার, সত্যেন্দ্র মজুমদার, চারু ভট্টাচার্য্য, 'শিশুভারতীর' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ পুস্তকের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা নহে। সাধারণ লোকের ভিতর বাঙ্গলীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা নিরাকরণ করিতে, এবং বাঙ্গালী ও ইংরাজের প্রাথমিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে অযৌক্তিক মতামত প্রচারিত আছে তাহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিতে চাহি নাই যে বাঙ্গালী একটি সর্ব্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠতম জাতি।

সময়ের অত্যাধিক অল্পতায়, যোগ্যতার অভাবে ও শারীরিক পীড়ার কারণে পুস্তকখানির বহুপ্রকার দোষ রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সেইগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে গ্রন্থকার তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। বাহুল্য ভয়ে অমর জীবনীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া কয়েকটী বিশিষ্ট জীবনী বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং জীবনী বিন্যাসও স্থানে স্থানে অসংলগ্ন হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ ত্রুটী সংশোধন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। সাধারণ পাঠকের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হওয়ায় যতদূর সম্ভব সরল, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকখানি দ্বিতীয়-বার পড়িবার সময় বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা জন্মে। মজিলপুর-নিবাসী প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীকালিদাস দত্ত জমিদার মহাশয়ের প্রেরণা না পাইলে আমার ইচ্ছা কোনদিনই ফলবতী হইত না। তিনি এ বিষয়ে আমাকে বহু পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন এবং তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে দিয়া অশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই আমার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। এতএব ইহার লিখনভঙ্গী পাঠকবর্গের মনোমত হইবে কিনা সে বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমার পুত্র শ্রীমান সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দিয়াছি এবং তাহার পরামর্শমত ভাষা বা বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যাঁহাদের পুস্তক হইতে নানাবিধ বিষয়—ভাব, ভাষা, মতামত, প্রত্নতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট অশেষ ঋণ স্বীকার ও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উপসংহারে বাংলার সুধীসমাজের নিকট প্রার্থনা যে আমার এই সঙ্কলনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যদি তাঁহারা নূতন নূতন তথ্য দ্বারা, বা ভুল প্রমাদ ও ত্রুটী প্রদর্শন দ্বারা সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহাদের নিকট চিরঋণী থাকিব। ইতি—

৬৫নং হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রাচীন যুগের
বাঙ্গালা
প্রাগ্‌জ্যোতিষ
(গৌহাটী)
কামরূপ
তীরভুক্তি
পাটলিপুত্র
শ্রীনগর
গয়া
মুদ্গগিরি
(মুঙ্গের)
ভাগলপুর
রাজমহল
কজঙ্গল
গৌড়
কোটীবর্ষ
সোমপুর
পুণ্ড্রবর্দ্ধন
(মহাস্থান)
পুণ্ড্র
উত্তর
রাঢ়
মুর্শিদাবাদ
কর্ণসুবর্ণ
(রাঙ্গামাটী)
বর্দ্ধমান
নবদ্বীপ
হরিকেল
সুবর্ণ গ্রাম
তাম্রলিপ্তি
(তমলুক)
দণ্ডভুক্তি
বঙ্গ উপসাগর
মাইল

আমরা বাঙ্গালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

—রবীন্দ্রনাথ

১। জননী বঙ্গের রূপ-পরিগ্রহ

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে" এক পুণ্যক্ষণে জননী বঙ্গ প্রকাশমানা হইয়া শস্যশ্যামলা স্বর্ণকুন্তলা দেহশ্রী পরিগ্রহ করিলেন, সেদিন আজ হইতে কত সহস্র শতাব্দী-পূর্ব্ব? যেদিন অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চলা সন্তানবৎসলা জননী রক্ত-কমল চরণদ্বয় সিন্ধুনীরে ধৌত করিয়া সন্তানকে বরাভয় দিয়াছিলেন, তখনও শুভ্র-তুষার-কিরিটীনি নগরাজ-হিমালয় জন্ম পরিগ্রহ করে নাই।

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমুদ্র প্রবহমান ছিল। কিন্তু তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে প্রয়াগের দক্ষিণে ভূভাগমাত্রই বর্ত্তমান ছিল না। পরন্তু ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা সুনিশ্চিত এবং সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান বঙ্গের সবটাই প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের কথাও একান্ত অলীক যাঁহারা বলিতে চান যে হাজার খানেক বা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের উর্ম্মিমালা বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে লীলায়িত হইত।

প্রত্ন-প্রস্তর-যুগ (খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর)—

ভূতত্ত্ববিৎগণের মতে এই বাংলা দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের ভূমি অতি প্রাচীন। পণ্ডিত কগিন্ ব্রাউন অনুমান করেন খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্ন-প্রস্তর-যুগ য়ুরোপ ও বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছিল। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের (Palœolithic Age) পাষাণ নির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু পার্ব্বত্য প্রদেশে নয়, সমতল ক্ষেত্রেও—হুগলী জেলার কুণকুণে গ্রামে, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত কুঠার-ফলক পাওয়া গিয়াছে। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানের কয়লার খনিতে ঐ প্রকার বহু পাষাণ নির্ম্মিত অস্ত্র মিলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মান্দ্রাজ হইতে এই সকল একই জাতীয় প্রস্তরে নির্ম্মিত অস্ত্র বঙ্গদেশ ও উত্তরাপথে—অর্থাৎ হাজার হাজার মাইল দূরে, আদি মানব কর্ত্তৃক বাহিত হইয়াছে।

নব্য-প্রস্তর-যুগ—

তারপর আদিম মানব লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পাষাণখণ্ড হইতে পূর্ব্ব প্রকারের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে থাকিয়া ক্রমশঃ নব্য-প্রস্তর যুগে (Neolithic Age) উন্নীত হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী যুগে ধনুর সাহায্যে শরনিক্ষেপের কৌশল আবিষ্কার করিয়া মানব অতিশয় দুর্জ্জেয় অতিকায় হিংস্র জীবসমূহ ধ্বংস করিতে শিখিয়া মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করে। সিংহভূম, ধলভূম, মানভূম ও রাঁচি প্রভৃতি জেলায়, হাজারিবাগে, পার্শ্বনাথ পর্ব্বতে ও আসামে নব্য-প্রস্তর যুগের প্রস্তর-নির্ম্মিত গদা, ছুরিকা, কুঠার, মুষল, প্রভৃতি পাষাণ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তাম্র-যুগ—

প্রস্তরযুগের পর তাম্রযুগ। হাজারিবাগ জেলায়, পচম্বা মহকুমায়, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝাটিবন পরগণার তানাজুরী গ্রামে এবং বারগুণ্ডা তামার খনির নিকটে বহু তাম্র নির্ম্মিত অলঙ্কার ও অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, হিমালয় পর্ব্বত জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে এই সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত শ্রেণী বিদ্যমান ছিল।

২। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেই বলিয়া দিতে পারে যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত, যথা প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, এবং এই পাঁচ বিভাগে মোট ২৭টী জেলা আছে। ইহা ছাড়া কোচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটি দেশীয় রাজ্য আছে। কিন্তু প্রাচীনকালের বাঙ্গালা এরূপ সুসংবদ্ধ ও সুবিস্তৃত ছিল না। তৎকালীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করাও কষ্টসাধ্য। গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণের এবং আরব ও চীনদেশীয় পর্য্যটক-দিগের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালার কিছু কিছু ভৌগোলিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্ম ও কাব্য পুস্তকের দিগ্বিজয় বর্ণনা ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের খননকার্য্য হইতেও বহু ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে সার্ আলেকজাণ্ডর কানিংহামের "প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোল" সুধী সমাজে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত।

প্রাচীন বঙ্গের পাঁচটি বিভাগ—

সাগরসম্ভূতা নদীমাতৃকা বঙ্গভূমি অতীতকালে স্বভাবতঃই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ভূভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে পাঁচটি ভূভাগই প্রধান এবং তাহাদের সমন্বয়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গড়িয়া উঠিয়াছে :—

(১) **বঙ্গ** (পূর্ব্ববঙ্গ) ; (২) **রাঢ় বা সুহ্ম** (পশ্চিমবঙ্গ) ; (৩) **পুণ্ড্র বা**

বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ); (৪) **সমতট বা বগ্‌ড়ী** (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ); ও (৫) **বাঙ্গালা** (পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গ)।

বঙ্গ—দক্ষিণে ভাগীরথী, উত্তরে খাসীয়া পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে মেঘনা ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উহার মধ্যস্থ ভূভাগকে 'বঙ্গ' বলিত। ইহার উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তস্থ ভূভাগকে কামরূপ বলিত। বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার পূর্ব্বে কামরূপের অন্তর্গত ছিল, এখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন কামরূপের উত্তরভাগ বর্ত্তমানে আসাম নামে পরিচিত। প্রাচীন 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালা' সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভূভাগ বলিয়া পরিচিত ছিল।

প্রাচীন কালে বঙ্গ বলিলে প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গ (ঢাকা অঞ্চল) বুঝাইত। সুবর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর, সাভার ও ঢাকা প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। পালযুগে বঙ্গ, উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সেন যুগে বিক্রমপুর-ভাগ ও নাব্য, এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

শ্রুতিস্মৃতিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি অব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পালি ভাষায় লিখিত বিনয়-পিটকেও বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। *

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বঙ্গগণের নিন্দাও দেখা যায়। বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্ম্মসূত্রে ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কলিঙ্গগণের দেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বুদ্ধদেব গয়ার নিকট উরু-বেলা গ্রামে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মিথিলার প্রধান নগরী বৈশালীতে, মগধের রাজধানী রাজগৃহে, এবং অঙ্গদেশের

---

* প্রাচীন গ্রন্থ যথা, পাতঞ্জল, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, মনুসংহিতা, বিষ্ণু পুরাণ ও বায়ু পুরাণ, রঘুবংশ এবং বরাহ মিহির লিখিত বৃহৎ সংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(বর্ত্তমান ভাগলপুর) রাজধানী চম্পানগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তিনি রাজমহলের নিকটবর্তী কাঁকজোল পরগণার অন্তর্গত স্থমেলু উদ্যানেও উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া পুণ্ড্র, রাঢ় বা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বঙ্গদেশের সহিত উত্তর ভারতের ঘনিষ্ট আদান প্রদান দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব চারিশতক হইতে খৃষ্টীয় চারিশতকের মধ্যে মহাভারত লিখিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য স্থধীগণ অনুমান করেন। সেই মহাভারতে আছে, পরশুরাম বঙ্গে লৌহিত্য তীর্থ স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইহা একটি আর্য্য-উপানিবেশ স্থাপনের কাহিনী। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষেও দেখা যায়, ভীমসেন বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও বঙ্গপতি মহতি গজসেনা হইয়া কৌরবপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস রচিত রঘুবংশে রাজা রঘুর সহিত বঙ্গীয় সেনার যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা—আবুল ফজল বঙ্গ ও বাঙ্গালা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে উহারা পৃথক্ পৃথক্ ভূভাগ বলিয়া পরিচিত ছিল। অসংখ্য খাল, বিল, নদী, খাড়ি দ্বারা বিভক্ত গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত দেশকে বাঙ্গালা বলিত। সম্রাট আকবর ও ঐতিহাসিক তারানাথের সময় সেই অর্থেই বাঙ্গালা শব্দের অর্থবোধ হইত। ১৫৬১ খৃঃ গ্যাষ্টালদিও উপরোক্ত ভূভাগকেই "বেঙ্গলা" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমশঃ বঙ্গ ও বাঙ্গালা এক নামেই পরিচিত হইয়াছে, আজ আমরা বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচিত।

'বঙ্গ' শব্দ 'বাঙ্গালায়' পরিণত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন যে বঙ্গদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে ভাসিয়া যাইত। সেজন্য বাঁধ বা আল দ্বারা সেই জল রোধ করা হইত। বোধ হয়, সেই কারণে "বঙ্গ" ও "আল" এই দুইটি শব্দের যোগে "বঙ্গাল" শব্দের উৎপত্তি হয়। রাজেন্দ্র চোল যিনি মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি

তাঁহার তিরুমলের শীলালিপিতে "বঙ্গাল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয় মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেই "বাঙ্গালা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমশঃ সমগ্র দেশের নাম "বাঙ্গালায়" রূপান্তরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের আর একটি প্রাচীন নাম ছিল, হরিকেল। কাহারও কাহারও মতে "হরিকেল" ও "সীলেট" অভিন্ন।

রাঢ় বা সুহ্ম—রাঢ় ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়া রাঢ় দেশ গঠিত হইয়াছিল। অজয়নদী রাঢ়কে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—যথা, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অতীতকালে উহাদের বলিত বজ্জভূমি ও শুভ্য-ভূমি। কেহ বলেন, রাঢ় শব্দ সাঁওতালী রাঢ়ো শব্দ (অর্থাৎ "নদীগর্ভস্থ পাথুরিয়া জমি" হইতে উৎপন্ন।

পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র—বর্ত্তমান মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহীর কতকাংশ লইয়া প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঠিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ, রাজসাহীর উত্তরাঞ্চল, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মালদহ জেলার পুর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া যে উচ্চ একটি ভূভাগ দৃষ্ট হয় তাহা "বরিন্দ" (উচ্চভূমি, বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত। পুণ্ড্র নামটি প্রাচীন, বরেন্দ্র শব্দটি উহার তুলনায় একান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। বরেন্দ্রের মৃত্তিকা সাধারণতঃ লাল ও স্থানে স্থানে হরিদ্রা রঙ্গের এবং কঙ্করময়। বরেন্দ্রীর একটি অংশ শ্রাবস্তীনামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন কান্তপুর (বর্ত্তমান কান্তনগর) ও নাটারী (বর্ত্তমান নাটোর) বরেন্দ্রভূমের প্রখ্যাত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। কেহ পাবনাকেও প্রাচীনকালে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বাঙ্গালাদেশের এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গৌড় (লক্ষ্মণাবতী), মহাস্থান (পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজধানী), পাণ্ডুয়া (গৌড়ের শেষ যুগের রাজধানী) প্রভৃতি নগরী প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত ছিল। পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ মালদহ জেলায় দৃষ্ট হয়। মহাভারতের অশ্বমেধ-

পর্ব্বে পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। হুয়েনসাং এর সময় হিরণ্যপর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী) প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য লইয়া গৌড়-বঙ্গ গঠিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, অঙ্গ ও বঙ্গ এক রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-যুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল জগদ্দলবিহার।

সমতট বা বগ্‌ড়ী—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রায় দুইশত মাইল বিস্তৃত ত্রিকোণাকার বদ্বীপকে "বগ্‌ড়ী" বা "সমতট" কহিত। যশোহর, খুলনা, পাবনা, ২৪ পরগণা, সুন্দরবনের একাংশ প্রভৃতি ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। বগড়ী শব্দটি সংস্কৃত "ব্যাঘ্রতটী" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান হয়। ব্যাঘ্রতটী অর্থে বুঝায় ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত ভূভাগ। একালেও সুন্দরবন "রয়েল বেঙ্গল টাইগারের" জন্য খ্যাত। এই অঞ্চলটি সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা এই গাঙ্গেয় "ব"দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। কেহ কেহ সমতটের রাজধানী ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

• হুয়েন সাং লিখিয়াছেন "সমতটরাজ্য চক্রাকৃতি। ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী। অধিবাসিগণ খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। রাজ্যে প্রায় একশত দেবমন্দির আছে। ত্রিশটি সঙ্ঘারামে দুই হাজার শ্রমণ বাস করেন।"

সেন রাজবংশের রাজত্বকালে 'বগড়ি' নিম্নলিখিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত ছিল—যথা, (১) অন্দ্রদ্বীপ (বর্ত্তমান বনগ্রাম প্রভৃতি); (২) সূর্য্যদ্বীপ (ভৈরবনদের উত্তর তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ, চুয়াডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত ছিল); (৩) মধ্যদ্বীপ (শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল); (৪) জয়দ্বীপ (পোড়াদহ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল); (৫) চক্রদ্বীপ বা চকদাহ; (৬) এড়ুদ্বীপ বা এড়েদাহ; (৭) প্রবালদ্বীপ (রাজপুর হইতে মথুরাপুর পর্য্যন্ত ঃ জয়নগর ইহার অন্তর্গত ছিল; সম্ভবতঃ প্রবাল হইতে জয়নগর-পলাবাড়ি নামের 'পলা' শব্দের উৎপত্তি); (৮) বৃদ্ধদ্বীপ (সাতক্ষীরা হইতে

বাগেরহাট পর্য্যন্ত); (৯) চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল জেলা); (১০) কুশদ্বীপ (গোবরডাঙ্গা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল ইহার অন্তর্গত ছিল); (১১) শ্রীধাম নবদ্বীপ (ইহা নয়টি দ্বীপের সমষ্টি, যথা, অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোল দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্র দ্বীপ)।

উপবঙ্গ—কেহ কেহ সমতটের সুন্দরবন অংশকে উপবঙ্গ বলেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মপুরাণে আছে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম প্রদেশে (উপবঙ্গ) চন্দ্রবংশীয় সুষেণ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহার নগরে তালধ্বজ নগরের রাজকন্যা সুলোচনা 'বীরবর' নাম গ্রহণ করিয়া পুরুষবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং একটি গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উল্লেখ রামায়ণ মহাভারতেও পাওয়া যায়; বর্ত্তমান সাগরদ্বীপে ও তন্নিকটবর্ত্তী ধবলাট প্রভৃতি স্থানে—বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অট্টালিকা পালযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

৩। প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিভাগ

শাসন-সৌকার্য্যার্থে রাজ্যকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হয়। সেকালেও সে প্রয়োজন অতিমাত্র অনুভূত হইত, বিশেষতঃ যখন যানবাহন ও রাস্তাঘাটের অবস্থা তত উন্নত ছিল না। আজকাল প্রাদেশিক বিভাগকে Division বলে, সেকালে বলিত "ভুক্তি"; বর্ত্তমানকালে যাহাকে জেলা বলে তাহাকে বলিত "মণ্ডল," এবং বর্ত্তমানের Subdivisionকে বলিত বষয়"। কোন কোন স্থানে 'মণ্ডল' ও 'বিষয়' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

পুণ্ড্র বর্দ্ধন বা বরেন্দ্র বাংলার পাঁচটি ভূভাগ মধ্যে সমৃদ্ধিশালী ও প্রাচীনতম প্রদেশ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেজন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেক সময় "পুণ্ড্র বর্দ্ধন" শব্দটি সমগ্র বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

যখন পাল রাজারা মগধ সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন শাসন-সৌকার্য্যার্থে তাঁহাদের সাম্রাজ্যকে তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা, শ্রীনগরভুক্তি (বিহার প্রদেশ), তীরভুক্তি (ত্রিহুত) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি (সমগ্র বঙ্গদেশ)। সেন রাজারা যখন সাম্রাজ্য হারাইয়া মাত্র বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছিলেন তখন তাঁহারা বাঙ্গালাকে তিনটি ভুক্তিতে ভাগ করিয়াছিলেন—যথা, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি। গৌড় রাজ্যমধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনৈতিক বিভাগ। ইহা উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে খাড়িমণ্ডল (বর্ত্তমান জয়নগর মজিলপুর গ্রামের ৭।৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার ও বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ২৪টি বিষয় বা 'মণ্ডলে' বিভক্ত ছিল। যথা, ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, কটিবর্ষ বিষয়, ব্রাহ্মণীগ্রাম মণ্ডল, নাব্য মণ্ডল, একাদশী বিষয়, খাড়ি মণ্ডল, বরেন্দ্রমণ্ডল, বঙ্গ, সমতট মণ্ডল প্রভৃতি। খাড়িমণ্ডলের পূর্ব্বভাগ 'পূর্ব্ব-খাড়িমণ্ডল' পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত পশ্চিম-খাড়িমণ্ডল বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

বর্দ্ধমানভুক্তি পূর্ব্বে হুগলী নদী, দক্ষিণে স্বর্ণরেখা ও উত্তরে অজয় নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্দ্ধমানভুক্তি চারিটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল, যথা—উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল, পশ্চিম খাড়িমণ্ডল ও দণ্ডভুক্তিমণ্ডল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল বলিয়া পরিচিত ছিল।

কঙ্কগ্রামভুক্তি সম্ভবতঃ বরাহমিহির প্রভৃতি বর্ণিত গৌড়-কর্ণ স্বুবর্ণ রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা, রাজমহল, কাঁকজোল এবং সাঁওতাল পরগণার কিছু কিছু অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহার ক্ষুদ্র বিভাগকে 'মণ্ডল' বা 'বিষয়' না বলিয়া "বিথী" বলিত।

৪। সমসাময়িক বাঙ্গালা

(ক) **তাম্রলিপ্তি**—বাঙ্গালার আর একটি প্রাচীন সুবিখ্যাত স্থানের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি, যাহাকে এখন তমলুক বলি। কাহারও কাহারও মতে ইহা পুণ্ড্রনগর হইতেও প্রাচীন। বঙ্গের বাণিজ্য, উপনিবেশ এবং কৃষ্টির ইতিহাসে ইহার দান অতুল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ দেখা যায়। প্লিনি ও টলেমি তাম্রলিপ্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং এখানে দুই বৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন এখানকার সঙ্ঘারামে এক সহস্র আচার্য্য বাস করিতেন। পঞ্চাশটি দেবমন্দিরও তিনি দেখিয়াছিলেন। এখানে যথেষ্ট মণিমুক্তা সংগৃহীত হইত। দেশবাসীর অবস্থাও সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তিই ছিল ভারতের বিশিষ্ট বন্দর। সিংহল, যবদ্বীপ, চীনদেশ, মালয় ও যবনদেশযাত্রীরা এখানে জাহাজে আরোহণ করিতেন। মগধের অভ্যুদয়কালে ইহা মগধ-অঙ্গ-বঙ্গের একমাত্র বন্দর ছিল। তাম্রলিপ্তি রাজ্য হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তির রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ময়ুর বংশ এখানে রাজত্ব করিত। পরে কৈবর্ত্তগণ (মাহিষ্য) তাম্রলিপ্তি রাজ্য অধিকার করেন।

(খ) **মগধ**—প্রাচীনকালে দক্ষিণ-বিহারকে মগধ বলিত। যে অনার্য্য জাতি এই বিভাগে বাস করিত তাহাদের নায়ক "প্রা-মগধ" হইতে সম্ভবতঃ মগধ নামের উৎপত্তি। আর্য্য বিজয়ের পরে সম্রাট জরাসন্ধ মগধের রাজা হন। তিনি শৈব ছিলেন এবং শিবের নিকট ১০৮টি রাজপুত্রকে বলি দিবার সঙ্কল্পে ৮৪টি রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভীমসেন হস্তে তিনি নিহত হন। ঐতিহাসিক যুগে শিশুনাগ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কন্ব, অন্ধ্র, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি বংশ মগধে রাজত্ব করেন। ইহাদের কেহ কেহ সমগ্র

ভারতে রাজচক্রবর্ত্তীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মগধের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। পরে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বৌদ্ধযুগে এই প্রদেশে অনেক বিহার স্থাপিত হওয়ায় দেশের নাম "বিহার" হইয়া যায়। মগধের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল "নালন্দা"।

(গ) **অঙ্গ**—অঙ্গ বর্ত্তমান "ভাগলপুর ডিভিসন"। অথর্ব্ব সংহিতায় "অঙ্গের" নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাহাদের নামানুসারে তাহাদের স্থাপিত রাজ্যগুলির নামকরণ হয়। অঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল "চম্পা"। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় অঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। অঙ্গের সুবিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল "বিক্রমশীলা"।

(ঘ) **বিদেহ বা মিথিলা**—মিথিলা বর্ত্তমান উত্তরবিহার। ইহা অতি প্রাচীন রাজ্য। অতীতকালে এই রাজ্যের রাজাদের "জনক" উপাধি ছিল। মহারাজ অজাতশত্রুর সময় লিচ্ছবীরা এখানে রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা দেশটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে এক একটি পৃথক্ "সাধারণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করে।

(ঙ) **কলিঙ্গ**—ইহা বর্ত্তমানের পুরী ও গঞ্জম জেলা লইয়া গঠিত ছিল। কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে মহারাজ অশোকের নয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তদ্দৃষ্টে মহারাজ অশোকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটস্থ ধাউলির অশোকলিপি আবিষ্কার হইবার পর কলিঙ্গের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে নূতন সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে।

(চ) **কর্ণসুবর্ণ**—মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ ভাগ ভাগীরথী গর্ভে

নিমজ্জিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন কর্ণসুবর্ণ আসেন তখন এই রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারামে দুই হাজার শ্রমণ বাস করিত। গুপ্তবংশীয় রাজগণ বহুকাল কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষের প্রাচীনতম ইষ্টকস্তূপ হইতে বহু নৃপতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

৫। বাংলার রাজধানী

গৌড়—পুণ্ড্রবর্দ্ধনের তুলনায় গৌড় আধুনিক নগর। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পাঁচটি গৌড় ছিল। ইহা হইতে 'পঞ্চগৌড়' নামের উৎপত্তি। অনুমান হয়, পাল সম্রাটগণ সমগ্র ভারতে রাজচক্রবর্ত্তীত্ব লাভ করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী অনুসারে পঞ্চগৌড় অর্থে সারস্বত (পূর্ব্বপঞ্জাব), কান্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল ও বঙ্গীয় গৌড় বুঝাইত। ইহাই পাল সম্রাট ধর্ম্মপালের বিজিত পঞ্চগৌড়।

পাল যুগে গৌড় বলিলে পঞ্চনদের কতকাংশ ব্যতীত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে বুঝাইত। আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাকেও গৌড়ের ভাষা বলিত। গৌড়ীয় রচনাপদ্ধতি সর্ব্বত্র আদৃত ও গৃহীত হইয়াছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে "গৌড়ী," "গৌড় সারঙ্গ" প্রভৃতি রাগ রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ওজঃ প্রকাশক শব্দ দ্বারা রচনা ও আড়ম্বরপূর্ণ সমাসবহুল রচনা "গৌড়রীতি" পদবী লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকালের "ভারত নাট্যশাস্ত্রে" উল্লিখিত আছে নাট্যাভিনয়ে "গৌড় পাত্রগণ" অর্দ্ধমাগধী ব্যবহার করিতেন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের গৌরব পূর্ব্বদিকে য়ুনান (টঙ্কুইন) পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে কাবুল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

পাণিনি সূত্র ব্যতীত খৃঃ ৮৯ শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ের নাম পাওয়া যায় না। কেহ বলেন, পুণ্ড্রনগরে কোন কোন অংশে খুব গুড়ের কারবার হইত, তাহা হইতে গৌড় নামের উৎপত্তি হয়। যোগবাশিষ্ট

রামায়ণে গৌড়ের নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে গৌড় ভট্টগণের লগুড় যুদ্ধের প্রশংসা আছে।

ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে প্রকাশ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গৌড়ে ধর্ম্মাদিত্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই তাম্রশাসন বিশ্বাস করিলে গৌড়ের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হয়। শিলালিপিতে পাওয়া যায় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা ঈশান বর্ম্মা গৌড় জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পালবংশ গৌড়ের রাজা হ'ন এবং চারি শত বৎসর রাজত্ব করেন। ধর্ম্মপাল সর্ব্বপ্রথম গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য অষ্টম শতাব্দীতে গৌড় আক্রমণ করিয়া গৌড় রাজকে বধ করিলে গৌড়বাসিগণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে কাশ্মীরের রামস্বামী বিগ্রহ ধ্বংস করেন, পরিহাস কেশবের মন্দির কোনরূপে তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস লেখক কহ্লণ গৌড়বাসিগণকে 'গৌড়রাক্ষস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেবমন্দির ধ্বংসের কথা হইতে মনে হয় গৌড়বাসিগণ তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

দিল্লী অঞ্চলের গৌড়-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাঁহারা মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞের সময় গৌড় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন।

গৌড় কলিকাতা হইতে ১৯৪ মাইল এবং মালদা সহর হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আধুনিক যুগে ৯০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার হিন্দু রাজগণ ও মুসলমান স্থলতানগণের ইহা রাজধানী ছিল। পাল রাজগণের রাজধানী প্রাচীন গৌড়ের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নাই। বর্ত্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কয়েক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীতীরে পাল বংশের রাজধানী গৌড় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বর্ত্তমান মালদার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বল্লালবাড়ী নামক উচ্চ ভূমিতে বোধ হয় পরবর্ত্তী সেন রাজবংশের রাজধানী গৌড় অবস্থিত

ছিল। খৃঃ ১৩৪৫ সালে সুলতান সামসুদ্দীন ইলায়াস্ শাহ পুরাতন গৌড়ের ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদে গৌড়ের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এক শত বৎসর পরে ১৪৪৬ খৃঃ নাসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার রাজধানী পুনরায় গৌড়ে সংস্থাপিত হয়। ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া সম্রাট বাবর দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিলে বহু সম্ভ্রান্ত আফগান গৌড় রাজ্যের তৎকালীন সুলতান নসরৎ সাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৩৮ খৃঃ শের শাহের সৈন্যগণ গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠন করে। খৃঃ ১৫৫০ সালে মহামারীতে গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। পাল রাজ্যের গৌড়, লক্ষ্মণ সেনের গৌড়, হিন্দু মুসলানের গৌড় আজ অরণ্যময়।

মহাস্থানগড়—ইহা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। ইহা কলিকাতা হইতে ২২৬ মাইল দূরে বগুড়া সহরের দশ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে পরশুরাম এই স্থানে তপস্যা করিয়া ইহার মহাস্থান নাম দেন। মহাভারতের যুগে পৌণ্ড্রক বাসুদেব এখানে রাজত্ব করিতেন। সম্প্রতি মহাস্থানে মৌর্য্য যুগের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও ইহার অস্তিত্ব ছিল। তখন পুণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬৪০ খৃঃ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান চোয়াং এই স্থানে ২০টী বৌদ্ধসংঘারাম, একশত হিন্দু মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দেখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা শৈব, বৈষ্ণব, স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় উপাসক, ও বৌদ্ধ এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। নগরী জনবহুল, অধিবাসীগণ অর্থশালী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মন্দির মধ্যে গোবিন্দ ও স্কন্দ মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল। মহাস্থানের ভগ্নাবশেষের মধ্যে 'গোবিন্দের ভীটা' দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান। ইহার নিকটে "গকুলের মেঢ়" নামক একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপটি চতুর্ব্বিংশতি

কোণ বিশিষ্ট। এই স্থান খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিভাগ প্রায় ১০৭টী কক্ষবিশিষ্ট অট্টালিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। পরস্পরের গাত্র সংলগ্ন এই কক্ষগুলিকে মৌমাছির চাকের খোপের মত দেখায়। এই স্তূপটী একটী বৌদ্ধ দেবায়তন ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তযুগে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহাস্থান মুসলমানগণের দ্বারা বিজিত হয়।

পাহাড়পুর—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত এবং জামালপুর রেলওয়ে (ই, আই, আর) ষ্টেশনের তিন মাইল দূরে পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়পুর নামটি আধুনিক, প্রাচীন নাম 'সোমপুর'। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া একটি বিরাট মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখা যায়।

মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পাহাড়পুরের এই বিরাট বিহার অবস্থিত। ইহার অনুরূপ গঠনরীতি ভারতবর্ষে সচরাচর না দেখা গেলেও ইহার সহিত যবদ্বীপের "বরবুদর" ও প্রামবাণম্", ও কাম্বোজের "আঙ্কোরভাট" প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির গঠনরীতির সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাঙ্গালার দান অসামান্য। নবাবিষ্কৃত সোমপুর বিহার সম-চতুর্ভুজ—প্রত্যেক ভুজটী ২২৮ ফুট লম্বা। চারিটি ভুজে ১৮৯টি প্রকোষ্ঠ এবং প্রবেশমুখে একটি বড় দালান আছে। এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে ৯২টিতে উচ্চ পূজার বেদী দৃষ্ট হয়। এই মহাবিহারে পালযুগ-পূর্ব্ব বহু নিদর্শন পাওয়া গেলেও সম্ভবতঃ ইহা পালযুগের প্রথমভাগে নির্ম্মিত। তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায় যে চারি শতাব্দী ব্যাপিয়া (খৃঃ নবম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত) 'সোমপুর বিহার' তিব্বতীয়গণের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ এখানে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরু রত্নাকর শান্তি এই বিহারের মহাস্থবির ছিলেন। মন্দিরের গাত্রে বহু হিন্দু দেব-

দেবীর ও রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত বহু দেবলীলার ছবি দেখা যায়। হিন্দুদের প্রথামত বিহারের প্রবেশ দ্বারও উত্তরমুখী। ইহা হইতে অনুমান হয় যে বৌদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। আরও দ্রষ্টব্য যে মন্দির-গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত (terracotta) যে সমস্তই জীব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সমস্তই বঙ্গদেশীয়। পাহাড়পুরে অবস্থিত একখানি তাম্র শাসনে বর্ণিত আছে যে ১৫৯ গৌপ্তাব্দে অর্থাৎ মধু গুপ্তের সময় এখানে একটি জৈন মন্দির ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনত্ব

হেথায় আর্য্য, হেথায় অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুণ-দল, পাঠান-মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।

—রবীন্দ্রনাথ।

১। বাঙ্গালী জাতিতত্ত্ব

পাঁচটি জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি—ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, নৃ-তত্ত্ববিদ্‌রা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদের কুলুজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝা যাইতেছে না। মুখ্যতঃ ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়া বলা যায় যে পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের ভাষা-ভাষী পাঁচটি জাতির সংমিশ্রণে উত্তরপূর্ব্ব ভারতের (বঙ্গদেশের) জনগণের উদ্ভব হইয়াছে।

(১) **নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু**—প্রথমতঃ সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ উর্ণাবৎ কেশযুক্ত "নেগ্রিটো" বা "নিগ্রোবটু" মানুষ বাস করিত। তাহারা কৃষিকার্য্য জানিত না, শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিত।

(২) **অষ্ট্রীক**—পরে আসামের উপত্যকাভূমি দিয়া ইন্দোচীন হইতে "অষ্ট্রীক" জাতীয় লোক বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। তাহারা পীতাভ বর্ণ ছিল। ক্রমশঃ "নিগ্রোবটু" ও "অষ্ট্রীকের" সংমিশ্রণে "কোল" বা "মুণ্ডা" জাতির উৎপত্তি

হয়। নিগ্রোবটু জাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্বচিৎ ঐ চেহারার লোক বাঙ্গালার নিম্নতম সমাজে দেখা যায়। অষ্ট্রীক জাতি কৃষিকার্য্য জানিত, ভেলায় নদী ও সাগর পার হইতে পারিত, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না এ ধারণাও তাহাদের ছিল। উত্তরকালের হিন্দুদের পুনর্জ্জন্মবাদ বোধ হয় এই সংস্কার হইতে গৃহীত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দান ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্ট্রীক জাতির ভাষা আমরা কোল ও খাসিয়াদের ভাষায় পাই। গঙ্গাতীরে তাহারা বাস করিত এবং "গঙ্গা" শব্দটী বোধ হয় অষ্ট্রীক ভাষার শব্দ। অষ্ট্রীক জাতির 'সুসভ্য' শাখা ভারতের কৃষিমূলক সংস্কৃতির অগ্রদূত। তাহাদের 'অসভ্য' শাখা হইতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুরকু, ভূমিজ, শবর, ভীল প্রভৃতির উৎপত্তি। "ইহা বেশ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে—ধান, পান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অষ্ট্রীক প্রভাবেরই ফল। ইহারাই প্রথমে তুলার কাপড় ব্যবহার করে"।

(৩) **দ্রাবিড় জাতি**—সম্ভবতঃ অষ্ট্রীকদের পরে দ্রাবিড়েরা ভারতে আসে। তাহারা আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে, অষ্ট্রীকরা আসিয়াছিল উত্তর-পূর্ব্ব হইতে। দ্রাবিড়েরা অধিকতর সভ্য এবং সঙ্ঘশক্তিতে বিশিষ্ট বলশালী ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারাই প্রথম যব ও গম চাষ করে। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা দ্রাবিড়দেরই দেবতা বলিয়া মনে হয়। যোগসাধন পদ্ধতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অষ্ট্রীকরা উত্তরভারতে এবং দ্রাবিড়রা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল হইয়াছিল। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে মিশ্রণ হয়। ছোটনাগপুরে দ্রাবিড়জাতীয় ওরাওঁ ও অষ্ট্রীক জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি বাস করিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বতের অনেক নাম অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত। যেমন দিস্তাং

হইতে তিস্তা, দামুদাক্ হইতে দামোদর, কব্‌দাক্ হইতে কপোতাক্ষ। বালুটে, বয়ড়া, চুঁচুড়া, পাবনা, বগুড়া ইত্যাদি নামগুলি অনার্য্য ভাষার বিকৃত পরিবর্ত্তন মাত্র।

অন্যূন তিন হাজার বছর আগে অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি লোক বাঙ্গালায় বাস করিত। আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠদান সংস্কৃত ভাষা তখন বাঙ্গালায় প্রবেশ করে নাই। ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দ্রাবিড়জাতি বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী"। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণ আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন কিন্তু বঙ্গবাসিগণ জাতি নির্ব্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল"। উক্তিটি বহুলাংশে সমীচীন হইলেও বঙ্গদেশে আর্য্য সভ্যতার বিরাট দান ও সংস্পর্শ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতি প্রাচীন কালেই আর্য্য ঋষি মার্কণ্ডেয়, সাংখ্যকার কপিল, মহাযোগী বশিষ্ট প্রভৃতির বঙ্গে আগমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

(৪) **ভোট-চীন**—ইহার পর আসিল আর্য্য এবং তৎপরে ভোট-চীন। ভোট-চীন জাতীয়েরা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। ইহাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিরা মেচ্, কোচ, প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দান নগণ্য।

(৫) **আর্য্য জাতি**—দ্রাবিড়জাতির পরে আসিল আর্য্য—প্রচণ্ড শক্তিশালী, কর্ম্মী, কল্পনাশীল, সঙ্ঘবদ্ধ জাতি; আর্য্যেরা আসিল উত্তর-পশ্চিম হইতে। তাহারা খণ্ড-ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক-ধর্ম্ম-রাজ্য পাশে, এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। প্রথমে আর্য্য ও অনার্য্যে স্বাভাবিক বিরোধ বাঁধিয়াছিল। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যদিও আর্য্যরা পার্থিব সভ্যতায় অনার্য্য অপেক্ষা খুব উন্নত ছিল না, তথাপি পাশব বল ও বুদ্ধি কৌশলে তাহারা অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া স্বকীয় সভ্যতা ও ভাষা বিজিতগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য

করিল। ক্রমে দ্রাবিড় ভাষা দাক্ষিণাত্য ব্যতিরেকে সমগ্র ভারতে বিলুপ্ত হইল। যাহারা আর্য্য-বশ্যতা স্বীকার করিল না তাহারা উত্তর ভারত ছাড়িয়া পূর্ব্বদেশে চলিয়া গেল। আর্য্যদের মধ্যেও জ্ঞাতিবিরোধ বাধে। বেদে দেখা যায় আর্য্যদিগের এক অংশ বৈদিক হোমযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রথা গ্রহণ না করায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্য্যরা অনার্য্যদিগের সহযোগে সেই সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ আর্য্য-দিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পর্য্যুদস্ত করেন। ফলে তাহারা উত্তর ভারত ছাড়িয়া পূর্ব্বদেশে গমন করে। ইহা হইতেই বঙ্গদেশের আদি আর্য্য সংশ্রবের সূত্রপাত।

মহাভারতে দেখা যায় মগধের ক্ষত্রবীর জরাসন্ধের নেতৃত্বে অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি দেশের সমস্ত রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য মথুরা অবরোধ করিয়াছিল, একবার নয় দ্বাদশবার। শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রোপকূলে রৈবতক পর্ব্বতে মথুরার রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ক্রিয়াকাণ্ড-বিশ্বাসী হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল তখন আর্য্যগণের এক বৃহতি অংশ অনার্য্যগণের সাহায্যে পূর্ব্বভারত হইতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যই আরণ্যকে, মনুসংহিতায়, ও কোন কোন পুরাণে বঙ্গদেশীয় আর্য্যগণের উপর সবলত্ব (পাতিত্ব) আরোপ করা হয়। পুণ্ড্রাজ বাসুদেব নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী" বলিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু চিরকাল এ বিরোধ রহিল না, উত্তর ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে এবং আর্য্য ও অনার্য্যে আপোষ হইয়া গেল। রক্তের সংমিশ্রণ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ফলে বৈদিক হোম যজ্ঞাদি অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করিয়া লইল, এবং অনার্য্যের ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান—পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্য্যায়, তান্ত্রিকমতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য্যরা স্বীকার করিয়া লইল। "আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।" এই সভ্যতায় অনার্য্যের দানই অনেক বেশী।

বাঙ্গালা কিন্তু সহজে তার বৈশিষ্ট্য হারাইল না। বৈদিক-ধর্ম্ম বিরোধী আর্য্যরা আসিয়া দ্রাবিড়ের সহিত মিশিয়া গেল, ফলে আর্য্যবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মমত বাঙ্গালায় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মই বাঙ্গালায় আনিল 'আর্য্যভাষা'। সেই আর্য্যভাষাই হইল অনার্য্য সভ্যতার কালস্বরূপ। ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালায় আর্য্য সভ্যতা প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এই সময় বাঙ্গালাদেশ মৌর্য্য সম্রাটগণের দ্বারা বিজিত হইল। ফলে বাঙ্গালাদেশ আর্য্য সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সভ্যতা তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল। ইহা ঘটিল খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শতক হইতে খৃষ্টীয় ৫০০ শতক মধ্যে অর্থাৎ ৮০০ বৎসর ধরিয়া এইরূপে অষ্ট্রীক, দ্রাবিড়, বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী আর্য্য ও গৌড়া আর্য্যের সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির পুষ্টি সাধিত হইল। তারপর খাস বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমিতে উদিত হইল পাল রাজ-বংশ (৭৪০ খৃঃ), যাঁহারা বাঙ্গালীজাতির উন্নত ললাটে গৌরবের রাজটীকা পরাইয়া দিলেন। তাঁহাদের পর আসিল বাঙ্গালায় সেন রাজবংশ।

খৃষ্টীয় দশম শতকে বাঙ্গালীর কণ্ঠে বাঙ্গালা ভাষা ফুটিয়া উঠিল। তারপর উত্তর ভারত হইতে আসিল পাঠান ও মোগল আক্রমণ। বিজেতা মুসলমান শীঘ্রই বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া এদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তাহাদের মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দ এদেশেই বাস করিয়া এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি না হওয়ায় তাহারা বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিল। মুসলমান বাঙ্গালী হইয়া গেল।

মুসলমান স্ফী ধর্ম্মমত কোরাণানুসারী না হইলেও বাঙ্গালার সংস্কৃতির তেমন বিরোধী না হওয়ায়, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া, পীর, মৌলভী প্রভৃতির প্রচারের ফলে বহু ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল।* কেহ ইস্‌লাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া,

* রাজসাহীর মখদুমের দরগা, সোণারগাঁয়ের পাঁচপীরের দরগা, ঢাকার ইক্কা, মীরপুরে

কেহ বা হিন্দু ধর্ম্মের নিয়ম বন্ধনের অসহনীয়তায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুর বিরোধের তীব্রতার ফলে, অনেক বৌদ্ধও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সমাজপীড়িত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও ধর্ম্মত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে মাত্র সংস্পর্শ দোষেই হিন্দুসমাজ হিন্দুকে পরিত্যাগ করিল। কোথাও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি দ্বারা বলপূর্ব্বক দীক্ষালাভও ঘটিল। সব চেয়ে হিন্দুর বিপদ আসিল ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুর নিকট হইতে। এ বিষয়ে কালাপাহাড়ের নাম বাঙ্গলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জটিলত্ব ও সূক্ষ্মত্বও কম বিপদের কারণ হয় নাই। রাজশক্তির সাহায্য ও রাজানুগ্রহের লোভও ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রসারের সহায়ক হইল। যুদ্ধে বন্দী বাঙ্গালার নর-নারী ও অবরোধ বিপর্য্যস্ত নগরীর অধিবাসীবৃন্দ সময়ে সময়ে প্রচুর সংখ্যায় নবধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল।

অষ্ট্রীক, দ্রাবিড় ও আর্য্যের সংমিশ্রণে যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মুসলমান আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। যদিও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে মিশ্রণ হইল না, তথাপি ভাষা ও কৃষ্টির একতা স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকাংশই খাঁটী বাঙ্গালীজাতি সম্ভূত। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর দুর্দ্দিন। রাজনৈতিক কারণে আজ বাঙ্গালী-মুসলমানকে ভারতের বাহিরে তাহার কৃষ্টি-গৌরব অনুসন্ধান করিতে প্ররোচিত করা হইতেছে।

কিন্তু ভুলিলে চলিবেনা যে বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের শিরায় প্রায় একই শোণিত প্রবাহিত, আমরা একই গৌরবের অধিকারী, আমাদের সমাজ-প্রকৃতি এখনও প্রায় অভিন্ন, আমরা একই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করি, আমরা একই মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একই অন্নে পুষ্ট, একই জলবায়ুতে জীবনধারণ করি। নবযুগের উদীয়মান হিন্দু ও মুসলমান তরুণ এই সমস্যার সমাধান করিবে।

আলিসাহেবের সমাধি, ত্রিবেণীতীরে কদমরসুল প্রভৃতি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের স্মৃতি-চিহ্ন জাগরূক রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস

দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী

১। আর্য্য ও অনার্য্য

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রুশদেশে উরাল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও কাস্পিয়ান ও আরাল হ্রদদ্বয়ের উত্তরে আর্য্য জাতির প্রথম বসবাসের সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের পথে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রথম আর্য্য বসতি পঞ্চনদে। এইখানে তাহারা ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতির সংস্পর্শে আসে। যে আর্য্যরা একদিন "অশ্ব ব্যবসায়ী" বলিয়া জগতে পরিচিত ছিল, তাহারাই ভারতীয় আর্য্য-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সভ্যতার সংঘাতে আসিয়া অভিনব চিন্তাধারা ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হয়। একদিকে ঋগ্বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচিত হইল, অন্যদিকে ভারতের দিকে দিকে তাহাদের বিজয় অভিযানের রণদুন্দুভি নিনাদিত হইল।

২। হিন্দু-সভ্যতার উৎপত্তি

পরবর্ত্তী কালে আর্য্য ও অনার্য্যের সাহচর্য্যে (পৃষ্ঠা ২৯) যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিল তাহাকে আমরা 'হিন্দুসভ্যতা' আখ্যা দিতে পারি। বাঙ্গালী যদি দ্রাবিড় গোষ্ঠীসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতায় তাহার দানের পরিমাণ অসামান্য।

৩। আর্য্যভূমির প্রসার

মনুসংহিতার মতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী মহাস্থান "ব্রহ্ম" বা "বেদ" নামে খ্যাত। এইখানেই প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পরই "ব্রহ্মর্ষি" দেশ—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন এই চারি ভূভাগ লইয়া উহার পরিস্থিতি। ব্রহ্মর্ষি দেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশের নাম "মধ্যদেশ", যাহার বিস্তার প্রয়াগ পর্য্যন্ত। তাহার পূর্ব্বস্থ সমস্ত দেশকে বলিত অনার্য্যভূমি। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মধ্যদেশের সীমানা কাশী ও বিদেহ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিগণ যে স্থানে হোমাগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত করিতেন, সেই আশ্রমের নিকটেই লোকাবাস ও সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিত এবং তদ্দেশ আর্য্যভূমি নামে গৌরবান্বিত হইত। কপিল মুনির আশ্রমের সান্নিধ্যেই শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তু স্থাপিত হইয়াছিল, কুশাম্ব ঋষির আশ্রমের সন্নিকটেই বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী নগরী স্থাপিত হইয়াছিল এবং শ্রবস্ত ঋষির আশ্রমের নামানুসারে কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নাম গ্রহণ করিয়াছিল। ঋষিরা অযোধ্যা ও বারাণসী হইতে সুদূর দক্ষিণে গোদাবরী তটবর্ত্তী নাসিক পর্য্যন্ত আশ্রমশ্রেণী স্থাপন করিয়া নদীতীর ধরিয়া যাতায়াতের যে সঙ্কীর্ণ একপদী মার্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হয় তাহাই "দক্ষিণাপথ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনুরূপভাবেই শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সায়েট) হইতে তক্ষশীলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজমার্গের সৃষ্টি হইয়া উহা "উত্তরাপথ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

৪। বাঙ্গালায় আর্য্যকৃষ্টি

গান্ধার হইতে বাঙ্গালার পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যভূমি প্রসারিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বিনা দ্বন্দ্বে ও নির্ব্বিচারে বাঙ্গালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার

প্রাচীন কৃষ্টি বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যসভ্যতাকে কোল দেয় নাই। প্রথমে দ্রাবিড়ি কৃষ্টি, পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিপ্লবী মতামতের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া মাত্র তুর্ক অভিযানের কিঞ্চিদধিক দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যকৃষ্টি বাঙ্গালাদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বাঙ্গালার আদি অধিবাসীরা সামাজিক নিপীড়নে পর্য্যুদস্ত হইয়া হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়।

৫। বৈদিক ও পৌরাণিকযুগে বাঙ্গালা

ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে। রামায়ণের যুগে বাঙ্গালাদেশ ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের সময়ে বাঙ্গালাদেশ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায় —যথা, পুণ্ড্র, মোদাগিরি, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, কলিঙ্গ, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি। তৎকালীন পুণ্ড্ররাজ্যের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন সম পর্য্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং বাসুদেবত্ব জ্ঞাপক শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত চিহ্নসকল ধারণে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইলে সসৈন্যে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। বগুড়ার নিকটস্থ মহাস্থান-গড় প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় মহাস্থানের নিকটস্থ গ্রামগুলি এখনও "গোকুল", "বৃন্দাবন", "মথুরা" প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া পৌণ্ড্র বাসুদেবের স্মৃতি বহন করিতেছে।

৬। খ্রীঃ পূর্ব্ব ঐতিহাসিক যুগ

সিংহলের প্রাচীনতম মহাবংশ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে খ্রীঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে "রালরাট্য" বা রাঢ়দেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহলদেশ জয় করেন। আরও প্রকাশ যে একজন বাঙ্গালী বীর খ্রীঃ পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আনাম রাজ্য জয় করিয়া সেখানে রাজা হ'ন। জৈনদিগের

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনগ্রন্থ "আয়ারাঙ্গ সূত্তে" উল্লেখ আছে যে জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী "লাঢ়" বা "রাঢ়দেশে দ্বাদশ বর্ষ বাস করেন। তাঁহার নাম হইতে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরের নামের উৎপত্তি। রাঢ়ের বাঙ্গালী জৈন শ্রুতিকেবলী ভদ্রবাহু মৌর্য্য সম্রাট মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার হস্তে উত্তর ভারতের রাজন্যবৃন্দ এক এক করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার অপরাজেয় বাহিনী ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গারিডেগণের নাম শুনিয়াই আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হয় নাই। ঐতিহাসিকগণের মতে গঙ্গারিডেরা ৬০,০০০ অশ্বারোহী সেনা, দুই লক্ষ পদাতিক, চারি হাজার চতুরশ্বযুক্ত যুদ্ধ রথ ও তিন হাজার হস্তী লইয়া মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিশ্বজয়ী বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছিল। প্রায় সম পরিমাণ মাগধী সৈন্যও তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল।

৭। গঙ্গারিডেরাই কি প্রাচীন বাঙ্গালী ?

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের পূর্ব্বভাগে ও গঙ্গার তীরভূমিতে গংগরী নামক (গ্রীক গংগরী শব্দের বহুবচনে হয় গঙ্গারিডে) একটি বৃহৎ ও পরাক্রমশালী জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ রাজ্যে বহু সংখ্যক দুর্ব্বার হস্তিবাহিনী থাকায় কোন বৈদেশিক রাজা ঐ দেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। রোম সম্রাট আগষ্টাসের সভাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার "জর্জ্জিকাসে" লিখিয়াছেন, "আমি আমার জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তোরণশীর্ষে হেম ও গজদন্তে গঙ্গারিডেগণের বীরত্বকাহিনী লিখিয়া রাখিব।"

গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির বর্ণনা অনুসারে গঙ্গারিডেরা সেই সমস্ত ভূভাগে বাস করিত যেখানে গঙ্গা নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। টলেমী

গঙ্গার পাঁচটী মুখের কথা বলিয়াছেন—যথা, ক্যাম্বিসন বা কাঁসাইএর মুখ (মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত), মেগা বা ভাগিরথীর মুখ, কাম্বারিখম বা কুমার যাহা আরিয়ালখাঁ বা হরিণঘাটার পথে সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, এ্যান্টিবোল, সম্ভবতঃ বুড়ি গঙ্গা (ঢাকা সহরের নিকট প্রবাহিত) এবং সিউডোষ্টমন্ অর্থাৎ "চোরা মুখ", যাহাকে পদ্মা ও মেঘনার মোহনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব দেখা যায়, গঙ্গারিডেগণের বাসভূমি বলিলে মেদিনীপুর হইতে বাখরগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রোপকূলস্থ ভূভাগকে বুঝায়।

এখন এই গঙ্গারিডেরা কাহারা? ইহারা কি বর্ত্তমানের বাঙ্গালী?

এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে খ্রীঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় আর্য্য উপনিবেশ প্রায়শঃই স্থাপিত হয় নাই। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে মাত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন রাজগণের সময়েও সমস্ত বাঙ্গালায় সর্ব্বসাকুল্যে ১২০০ হইতে ২০০০ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী, একশত কায়স্থ গোষ্ঠী ও তাহাদের শূদ্র পরিচারকগণই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু। ইহা যদি আংশিকভাবেও সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ছাড়া বাকী লোকের কি ধর্ম্ম ছিল? তাঁহারা কি বৌদ্ধ ছিলেন? নবাবিষ্কৃত আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে উল্লিখিত আছে যে গোপালদেবের সিংহাসনারোহণের সময় (খ্রীঃ ৭৯০) বাঙ্গালাদেশ অবৌদ্ধ (তীথিক) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাহা হইলে এই অবৌদ্ধেরা কাহারা? ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় হইতে আমরা এই তথ্য পাই যে বাঙ্গালায় নানা কৌম্যের (tribe) বাস ছিল। তাহাদের ধর্ম্ম কৌম্যগত ধর্ম্ম ছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—তাহাদের ভাষাও ছিল বিভিন্ন। পরে বাঙ্গালার বাহির হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আসিয়া তাহাদের জয় করে। এই বিজিত অবস্থাই তাহাদের পাতিত্যের কারণ হয়। পরে তাহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৌম্যসত্ত্বা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতিতে (caste) পরিণত হয় এবং হিন্দু সমাজের এক প্রান্তে স্থান গ্রহণ করে। তাহা হইলে শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় অতীত যুগের গঙ্গারিডেগণের অনুসন্ধান পাইতে হইলে আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ভিতরে।

৮। মৌর্য্যযুগের বাঙ্গালা (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)

অনুমান করা হয়, ৩৩৭৪ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ঐ ঘটনা হইতে **নন্দবংশের** রাজা মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল কিঞ্চিদধিক এক সহস্র বৎসর। তিনি শূদ্রাণী গর্ভসম্ভূত। তাঁহার হস্তে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংশ হয়। নন্দবংশের পূর্ব্বে **শিশুনাগ** বংশীয় রাজারা রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করিয়া আনুমানিক ৬৪২ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৪৭০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ বংশে বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা জন্মিয়াছিলেন। চাণক্য **নন্দবংশ** ধ্বংশ করিয়া **মৌর্য্যবংশের** প্রতিষ্ঠা করেন। **মৌর্য্যবংশ** প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মুরা নামনী শূদ্রাণীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া ঐ বংশ মৌর্য্যবংশ নামে অভিহিত হয়। অতএব দেখা যায় ভারতের ইতিহাসে পুনরায় শূদ্রবংশের আধিপত্য হয়, ক্ষাত্রবীর্য্য লোপ পায়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন কিন্তু তৎপুত্র **সম্রাট অশোক** মৌর্য্য বংশকে জগতের ইতিহাসে অমর করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার মৃত্যুর ৪৭ বৎসর মধ্যে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগ হেতু ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলতায় এত সত্বর মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সম্রাটগণের অক্ষমতাও সম্ভবতঃ এই ধ্বংসের মূল কারণ।

মৌর্য্যযুগে মগধ ও বাঙ্গালা এক রাজ্যভুক্ত হয়। অন্ততঃপক্ষে পৌণ্ড্রের উত্তরাংশ মগধ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। মৌর্য্যরাজবংশের আদিগুরু

হইতেছেন রাঢ়ীয় জৈন শ্রুতিকেবলী ভদ্রবাহু। শেষ মৌর্য্য নৃপতি বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৮৫ অব্দে সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজা হ'ন। তিনি **সুঙ্গ** বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। কথিত আছে তিনি মহারাজা অশোক স্থাপিত ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করেন ও অক্ষয় বটের মূলচ্ছেদ করেন। খ্রীঃপূঃ ১৮ অব্দে সুঙ্গবংশের পতন হইলে **কান্ব** ও **অন্ধ্র** বংশ মগধের অধিপতি হ'ন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন এবং নব্য ব্রাহ্মণ্যযুগের প্রবর্ত্তন কর্ত্তা।

৯। গুপ্তযুগে বাঙ্গালা (চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী)

গুপ্তবংশের আদি রাজা **চন্দ্রগুপ্ত**। এই বংশে সমুদ্রগুপ্তই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হ'ন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল "বিক্রমাদিত্য"। কালিদাস তাঁহার সভাকবি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন গুপ্ত রাজগণের আদি বাসভূমি যে বরেন্দ্রী, ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। গুপ্তবংশ যদি বাঙ্গালী হ'ন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গালীর অবদান চিরমহিমান্বিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৌণ্ড্রের খ্যাতি যখন বিশ্ববিশ্রুত, তখন মগধের সৃষ্টি হয় নাই। গুপ্তবংশের অবনতির সঙ্গে বাঙ্গালায় আবার বহু ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদয় হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই দক্ষিণ বঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য, সমাচার দেব ও গোপচন্দ্র নামে স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করিতেন।

১০। গৌড়-ভুজঙ্গ—শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী)

সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী) অধিপতি **মহারাজ শশাঙ্ক** মগধ, কান্যকুব্জ ও কামরূপ হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত উত্তর-ভারত বাঙ্গালীর বাহুবলে জয় করিয়া ও অপরাজেয় হূণদিগকে বারম্বার পরাজিত করিয়া বাঙ্গালীর উন্নত ললাটে জয় টীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অবসানের পর বাঙ্গালা ও তথা ভারতে অন্ধকার যুগের আবির্ভাব হয়।

কোন পরাক্রান্ত নৃপতির অভাবে সমগ্র ভারত খণ্ড বিখণ্ড দুর্ব্বল রাজ্যসমূহে বিভক্ত হইয়া পড়ে। শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন।

১১। বাঙ্গালী-পালবংশ (খ্রীঃ ৮-ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দী)

এই যুগে বাঙ্গালা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। প্রজা সাধারণের মনোনয়নে প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্রভূমে **গোপালদেব** গৌড়-বঙ্গ-মগধ সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার পুত্র **ধর্ম্মপালদেব** বাঙ্গালীর ভূজবলে উত্তরে আফগানিস্থান ও কাশ্মীর, পশ্চিমে বোম্বাই, দক্ষিণে সেতুবন্ধ ও পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। পাল শাসনকালে বর্ত্তমান বাঙ্গালার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কামরূপকে এক রাজ্যপাশে আবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান বৃহদ্বঙ্গের গোড়াপত্তন হয়। ধর্ম্মপালদেব "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি" উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রায় চারিশত বর্ষ পালবংশ বঙ্গে রাজত্ব করিবার পর সেন বংশ বাঙ্গালা অধিকার করে। পালবংশে ধর্ম্মপালদেব ও তাঁহার পুত্র দেবপালদেব সমগ্র ভারত স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। নারায়ণপালদেবের রাজত্বকালে তীরভুক্তি, মগধ ও অঙ্গ পালরাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় গৌড় হস্তচ্যুত হয়, দ্বিতীয় পাল বংশের মহীপালদেব নিজ বাহুবলে পুনরায় বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার পর কয়েকজন পালবংশীয় নরপতি দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন। অবশেষে **রামপাল** দেব দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় পাল সাম্রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন। কিন্তু তাঁহার পর পালবংশের দ্রুত অবনতি ঘটে। পালবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল।

১২। বাঙ্গালার সেন বংশ

সেন বংশীয়গণ কর্ণাট দেশবাসী—চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। তাঁহারা সম্ভবতঃ পালরাজগণের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে আসিয়া বসবাস করেন।

পরে **বিজয় সেন** রাঢ়দেশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি বরেন্দ্র, বঙ্গদেশ, মিথিলা, উৎকল ও কামরূপ জয় করেন। দূরাগত দেশ হইতে অভিনিবিষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছে, সেনবংশ বাঙ্গালী হইবার পর বঙ্গদেশে রাজত্ব স্থাপন করে। বিজয় সেনের পুত্র **বল্লাল সেন** বঙ্গদেশে নূতন সমাজ ব্যবস্থা ও কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। বল্লাল সেনের পুত্র মগধ বিজয় করিয়া কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইহার সময়ই সেন বংশের চরম উন্নতির সময়। সেন রাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন।

১৩। তুর্ক বিজয়—বাঙ্গালার পতন

গাজ্নীর মামুদের সময় হইতে কিছু কিছু মুসলমান উত্তর ভারতে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। ইহার পোষকে জয়চন্দ্রের পিতামহ গোবিন্দ চন্দ্রের তাম্রশাসন সমূহে "তুরস্ক-দণ্ড" অথবা মুসলমানগণের উপর "জিজিয়া" কর স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মুসলমানগণ মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পূর্ব্বেই উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট ছিল। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথের "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে বাঙ্গালায় লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে মগধে তাজিকদের (মুসলমান) ম্লেচ্ছমতে বিশ্বাসী অনেক লোকের উদয় হয়। তৎপর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্ব্বেদীতে (প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ভূভাগ) তুরস্ক রাজ (বক্তিয়ার খিলিজি) আবির্ভূত হ'ন। তিনি তাঁহার সংবাদবাহী বিভিন্ন ভিক্ষুর মধ্যবর্ত্তিতায় বাঙ্গালা এবং উহার আশেপাশের ক্ষুদ্র তুরস্ক রাজাদের সহিত নিজের যোগস্থাপন করিয়া সমস্ত মগধ লুণ্ঠন করেন ও ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংস করেন। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ তাঁহার "তাবাকিতি-ই-নাসিরি" গ্রন্থে নদীয়া বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরা তুরস্ক আক্রমণের প্রাক্কালে রাজাকে এই বলিয়া ভয় দেখান যে তাহাদের শাস্ত্রে তুরস্কগণের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। বিক্রমশীলার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য

রত্নরক্ষিতও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে মুসলমানরা মগধের দুইটি বিহার ধ্বংস করিবে। তাঁহার কথামত বহু পণ্ডিত পূর্ব্বাহ্নেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। অর্থাৎ দেখা যায়, মগধ ও বাঙ্গালার একদল লোক—ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ রাজা ও পূর্ব্ব হইতে অভিনিবিষ্ট ভারত প্রবাসী মুসলমান, বক্তিয়ার খিলিজির বিভীষণ বাহিনীর (পঞ্চম বাহিনীর) কার্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটী অংশ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া হিন্দুজাতির ধ্বংসের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বনে পশ্চাৎপদ ছিল না। তুরস্কগণের বিজয়ী হস্ত বাহুবল অপেক্ষা এই পঞ্চমবাহিনীর সমর্থনে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ভারতের কতকগুলি প্রদেশে অহিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ: করায় কতকগুলি জাতি হিন্দুসমাজে অবজ্ঞাত হইত। তাহারাও তুরস্ক আক্রমণের সময় বিপক্ষ পক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। "চাকনামায়" উল্লিখিত আছে যে মুলতানে পতাকা উড়াইয়া ও শঙ্খধ্বনি সহকারে জাঠেরা ও মেদিরা মহম্মদ বিন কাশেমকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিল। ঐ সকল হিন্দুর এতাদৃশ বৈরিতা ও বিরাগের কারণ ছিল যে হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলিয়া বিবেচনা করিত। যাহা হউক, নৈরাজ্য মগধ খিলিজির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দ্বারা লুণ্ঠিত হইতে লাগিলে, প্রতিরোধ করিবার কেহ ছিল না। বাঙ্গালার সেন রাজগণের দুর্ব্বল হস্ত হইতেও গৌড় অচিরকাল মধ্যে খসিয়া পড়িল।

১৪। গৌড়ে স্বাধীন রাজত্ব, বাঙ্গালার স্বাধীনতা ঘোষণা

বখ্‌তিয়ার গৌড় অধিকার করিলে পর তাঁহার পরবর্ত্তী সুলতানগণ দিল্লীর অনুমোদন সাপক্ষে গৌড়ে রাজত্ব করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সুলতান অল্পকালের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পরাস্ত: বা নিহত হন।

অবশেষে সুলতান ইলিয়াস্ শাহ ১৩৪৮ খ্রীঃ বাঙ্গালার স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। এই সালটি বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয়। **গৌড়ের সুলতানগণ**

বুঝিতে পারেন যে দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে বাঙ্গালী হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত সে স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব। এই সময় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার জন্য যে দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে প্রায় দুই শত বর্ষ কাল বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানগণ দিল্লীর বাদশাহগণের অধীনতা মুক্ত হন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি সম্ভবপর নহে?

১৫। হিন্দুজাতির পুনরুত্থান—গণেশ ও দনুজমর্দ্দন

কিয়ৎকালের জন্য রাজা গণেশ গৌড়ে ও দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুয়ায় সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা গণেশের রাজত্বকাল দীর্ঘ না হইলেও তিনি হিন্দুধর্ম্মের ও সংস্কৃতভাষার অভ্যুত্থানের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফল সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। রাজা দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে পেশোয়ার হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগে তিনি ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুরাজা নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহসী হন নাই।

১৬। মোগল আমলে বাঙ্গালার পরাধীনতা

পাঠান অধিকারে বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় অধীনতা স্বীকার করিলেও তাহার শৌর্য্যবীর্য্য হারায় নাই এবং বহুল পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু মোগল অধিকারে **বাঙ্গালার দ্বাদশ আদিত্য** একে একে অস্তমিত হইল। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধানতম দ্বাদশ ভূঁইয়ারা একে একে মোগল কর্ত্তৃক বিজিত ও নিহত হইলেন। বাঙ্গালা সেই হইতেই বাস্তবপক্ষে নিরস্ত্রীকৃত হইল। বাঙ্গালীর পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইল।

১৭। ইংরাজ আমলে বাঙ্গালা

এতদিন স্বাধীনতা বলিলে যাহা বুঝাইত তাহার স্বরূপ ইংরাজ আমলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন স্বাধীনতা অর্থে ইংরাজ অধীনে স্বায়ত্বশাসন বুঝায়। ১৯৩৭ সালের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাই আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার বাস্তব রূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর ভাষা ও লিপি

১। বঙ্গভাষা

বাঙ্গালীর ভাষা—১। আর্য্য বিজয়ের ফলস্বরূপ বাঙ্গালা-ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ মধ্যে আর্য্য ভাষা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। পরবর্ত্তী খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত আট শত বৎসর মধ্যে বাঙ্গালাদেশ আর্য্যসভ্যতার সহিত আর্য্য ভাষাও গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হইল। ২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে উত্তর ভারতে মাগধী প্রাকৃত চলিত ছিল। এই মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টীয় ৮০০র দিকে মাগধী অপভ্রংশে লোকে কথা বলিত। এই সময়েই (৭৪০ খ্রীঃ) বরেন্দ্রভূমে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন হইতেই স্বতন্ত্র ভাষার জন্য বাঙ্গালীর মন ব্যস্ত হয়। **পাল রাজগণের রাজত্বের দুই শত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়ায়।**

পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুইপাদ ও তাঁহার চেলারা এবং নাথপন্থ নামক ধর্ম্মের নাথেরা বাঙ্গালা ভাষার অনেক বহি ও কবিতা লেখেন। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সময় বৌদ্ধেরা, জৈনেরা ও নাথেরা এরূপ বিপন্ন হন যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি সহ বাঙ্গালার বাহিরে পলাইতে বাধ্য হন। নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল পুস্তক ও তাহার তেঙ্গুর—অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও তৎকর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের নাম এবং সম্ভবস্থলে তাঁহার বাসভূমির নাম, সংগ্রহ করেন।

তাঁহার সংগৃহীত বৌদ্ধ গ্রন্থ **"চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"** পুঁথি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত পুঁথির লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আনুমানিক ৯০০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা। উহা মাগধী অপভ্রংশের পরিণতি হইলেও খাঁটি বাঙ্গালার রূপ লইয়াছে। ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নাম লুইপাদ, কহ্নপাদ, সরোরুহবজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি। ডাক ও খনার বচনের কবিরা, শূন্যপুরাণের রামাই পণ্ডিতও এই যুগের। ইহারা (বৌদ্ধরা) কীর্ত্তনের আদি স্রষ্টা। পরবর্ত্তী যুগে চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচারার্থ এই **কীর্ত্তনপ্রথা** গ্রহণ করেন।

তারপর বাঙ্গালায় আসিল বিজয়ী মুসলমান। তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলে হিন্দুরাও আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ সময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে—একদিকে মুসলমানের অত্যাচারে নিপীড়িত, অন্যদিকে নব পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের সংঘর্ষে হীনবীর্য্য। বাঙ্গালার হিন্দুদিগের এককই একদিকে সহজবোধ্য মুসলমান-ধর্ম্ম ও অপর দিকে ভিন্নধর্ম্মী রাজশক্তির সহিত বোঝাপড়া করিবার প্রয়োজন হইল। ফলে, **রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান, নানাপ্রকার মঙ্গল-কাব্য** প্রভৃতি (যথা, লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন, গোপীচাঁদ প্রভৃতির কথা) সহজ ও সরস বাঙ্গালায় প্রণীত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিল। ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেনের মতে প্রাগুক্ত পুস্তকগুলি মুসলমান রাজাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাহায্যেও লিখিত হইয়াছিল।

এদিকে বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহির হইতেও জ্ঞান আহরণ করিয়া ফিরিল। **মিথিলা হইতে স্মৃতি ও ন্যায়, এবং বিদ্যাপতির সুমধুর পদাবলী** আসিয়া পৌছিল। বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে গিয়া মৈথিল ও বাঙ্গালার সমন্বয়ে **"ব্রজবুলি"**র সৃষ্টি হইল। তারপর ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পূতসলিলা দুকুল-প্লাবিণী গঙ্গার স্বচ্ছ প্রবাহের ন্যায় আসিল **শ্রীচৈতন্যের নাম-ধর্ম্ম**।

শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিল তাহা অপূর্ব্ব ভাব-

ভক্তি-রসাত্মক,—বাঙ্গালাভাষা এইবার চরম পুষ্টিলাভ করিল। শুধু ভাষায় নয়, বাঙ্গালা আবার নবীন উদ্যমে হাজার বৎসর পরে নূতন উপনিবেশের অনুসন্ধানে—মহত্তম ও বৃহত্তম বঙ্গের অন্বেষণে—বিজয় অভিযান আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী আবার পুরী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিল। যাঁহারা বলেন উত্তরকালের বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ইংরাজের অনুগ্রহে, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ইংরাজ-পূর্ব্বযুগেই স্থাপিত হয়, তাহার কর্ম্মশক্তিই ইংরাজকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর যুগে যুগে উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রেরণাই বাঙ্গালীকে সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালার পাঠান-অধীনতা বাঙ্গালাকে কূপমণ্ডুক করিয়া রাখিয়াছিল। মোগল-বিজয়ের সহিত বাঙ্গালায় বহুকাল পরে **বৃহত্তর ভারতের বাণী** আসিয়া পৌছিল। এ পরিচয় আজও চলিয়াছে এবং শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আবহমানকাল চলিবে।

বর্ত্তমান কালের সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে আবশ্যক না হইলেও নবযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যরথীগণের নামোল্লেখ না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন, জগৎসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ, রমেশচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, কালীপ্রসন্ন, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি।

২। বাঙ্গালার লিপি

বাঙ্গালার লিপি—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন "ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, সৌরাষ্ট্র-

লিপি ও মগধলিপি শিখিতেছেন। ইহাত খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের কথা"। কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালালিপি নিঃসন্দেহে পরবর্ত্তীকালে উদ্ভব হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি **"ব্রাহ্মী লিপি"**। নেপাল তরাই-এ প্রিপ্রাওয়া নামক স্থানে একটি স্তূপের ভিতর হইতে বুদ্ধদেবের অস্থি-সংরক্ষিত একটি পাত্রাধারে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ব্রাহ্মী-লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। **"অশোক লিপি"** ইহার পরবর্ত্তীকালের। এই অশোক লিপি হইতে ক্রমশঃ লিখিবার ধরণ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরে দাঁড়াইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে যে ধরণ দাঁড়ায় তাহাকে "দাক্ষিণাত্য রীতি" ও উত্তর ভারতবর্ষে যে রীতি দাঁড়ায় তাহাকে **"উত্তরীয় রীতি"** আখ্যা দেওয়া হয়। পরে এই উত্তরীয় রীতি **"গুপ্তলিপি"** নামে পরিচিত হইয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরীয় বা উত্তর ভারতীয় লিপি আবার **"পূর্ব্ব ভারতীয়"** ও "পশ্চিম ভারতীয়" দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। বাঙ্গালা লিপি "পূর্ব্ব ভারতীয়" হইতে উদ্ভূত। **পালবংশীয়গণের তাম্রশাসনগুলির বাঙ্গালা অক্ষর বেশ বুঝা যায়।**

৩। বাঙ্গালাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য হইবার দাবী

ভারতের জাতীয় মহাসভা **"হিন্দুস্থানী"** ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার গৌরবদান করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দিও নয়, উর্দ্দুও নয়, ইহা অতীতযুগের মোগল শিবিরে কথিত হিন্দী ও উর্দ্দুর সংমিশ্রণে উদ্ভূত চলিত ভাষা। ইহার কোন ব্যাকরণ নাই, কোন সাহিত্য নাই—এক কথায় কোন মর্য্যাদা নাই। তবে আশা করা যায় যে রাষ্ট্রভাষার সম্মানিত পদবীতে উন্নীত হওয়ার দরুণ সত্বরেই ইহা ঈপ্সিত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এ দাবীতে কোন প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব নাই, কাহারও কোন অন্তর্দাহের কারণ নাই। একটী সর্ব্বভারতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু গোল বাধাইল হিন্দী সাহিত্য প্রচার সভার পাণ্ডাগণ। যাহারা হিন্দী সাহিত্য প্রচার কল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে, স্বতঃই তাহারা হিন্দুস্থানীর নামে হিন্দীর প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টিত হইবে। সুদীর্ঘ ত্রিংশাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাহারা হিন্দীর দাবী স্বীকার করাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তদবধি বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি হিন্দীভাষায় অনুবাদ করিয়া যাইতেছিল। বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, প্রভাতকুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, গিরীশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, কাব্য ও গানগুলি পর্য্যন্ত হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার অধ্যাপক অমরনাথ ঝা কোন অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট না হইয়া প্রকৃত সত্য কথাই বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান হিন্দীভাষা বাংলাভাষার নিকট বহুলাংশে ঋণী। বিশেষ করিয়া উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব।......রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার নিকট হিন্দী সাহিত্য কতখানি ঋণী সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

যাহা হউক, হিন্দী সাহিত্যের সমর্থনকারীদের চেষ্টার তারিফ করিলেও, হিন্দুস্থানীর পরিবর্ত্তে হিন্দীর দাবী সকলে মানিয়া লইতে চাহিল না। মান্দ্রাজ প্রদেশে বহু ব্যক্তি তথা কথিত নবীন রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া কারাবরণ করিতে ইতঃস্তত করেন নাই। অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিবাদ হইল। বাঙ্গালার প্রধান ভয় যে হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হইলে হেম-বঙ্কিম-নবীন-শরৎ-রবীন্দ্র সাহিত্য একদিন বিস্মৃতির অতলজলে ডুবিয়া যাইবে।

এখন দেখা যাউক হিন্দীর দাবী কোথায়? বাংলার দাবীও কি অচল? প্রথম প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যের দাবী কি প্রণিধানযোগ্য! উত্তরে বলা যায় সমগ্র ভারতে সাহিত্য হিসাবে বাংলার দাবী অগ্রগণ্য ও অবিসংবাদী। দ্বিতীয়তঃ বাংলা শিখিতে প্রতিপদে কি ব্যাকরণের জটীল সূত্র জানা প্রয়োজন? উহা আদৌ প্রয়োজন নহে, অপরপক্ষে হিন্দী ভাষা ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে

শিক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় প্রশ্ন, হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বাংলা ভাষাভাষীর তুলনায় বেশী না কম? হিন্দীর সমর্থকগণ বলেন হিন্দীভাষীরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু আদমস্থমারীর তালিকা গ্রহণযোগ্য নহে। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন উক্ত তালিকায় পৌর্ব্বী হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দী আলাহিদা ভাবে না দেখাইয়া একত্রে দেখান হইয়াছে। হিন্দী বলিলে পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র বুঝায়। তাহার উপর এলাহাবাদ, পাঞ্জাব ও বিহারকে পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিহারীর সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদৃশ্যই অধিক। তাহার উপর উক্ত তিন প্রদেশের বহুলোক উর্দ্দৃ ভাষাভাষি। অপরপক্ষে বাংলাদেশ ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বহু পরিমাণে বাংলা ভাষাভাষির অস্তিত্ব আছে। অধিকন্তু উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সহিত বাংলাভাষার সম্পর্ক নিকটতম। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাংলা ভাষাভাষির সংখ্যা প্রায় তের কোটী এবং হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র চারি কোটী।

উপসংহারে বক্তব্য যে রাষ্ট্র ভাষা কোন জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিসংগত নহে। ভারতীয় প্রদেশগুলি আকারে এক একটী এত বৃহৎ এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাভাষির সংখ্যা এত অগণিত যে কাহারও অনুকুলে অন্যের দাবী উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা যায় না, বিশেষতঃ যখন তাহাদের উৎপত্তি ও প্রগতি স্বাভাবিক বিবর্ত্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে বাঙ্গালী জাতির ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই "প্রপাগাণ্ডার" যুগে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বজায় রাখিতে হইলে প্রচার ব্যপদেশে উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর বল

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত মেষ।

দ্বিজেন্দ্রলাল

পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালীর বীর্য্য—সেকালের বাঙ্গালা—পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, প্রাগজ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সমষ্টি ছিল। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতে, হরিবংশে, পুরাণাদিতে পাই। পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান্ প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ ও তাম্রলিপ্তিপতির সাক্ষাৎ পাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সভায়ও তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয়গণের নিকট হইতে অশ্বমেধের যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার করিতে ভীমার্জ্জুনকে বহু আয়াস পাইতে হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীর্য্যবান্ রাজগণের তালিকায় বঙ্গাধিপ প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, পৌণ্ড্ররাজ, তাম্রলিপ্তি-পতি প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটোৎকচ যখন রাক্ষস-পুঙ্গবগণে পরিবৃত হইয়া খ্যাতিমান্ সকল মহারথীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বধে উদ্যত হয় তখন বঙ্গাধিপই তাঁহাকে রক্ষা করেন। যখন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ,শল্য প্রভৃতি মহারথগণ 'ধৃতরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্যসহ যুদ্ধে বিমুখীকৃত', তখন পিতামহ ভীষ্মকে প্রাগজ্যোতিষপতি ভগদত্তকে অনুরোধ করিতে শুনি,—"মহারাজ, আপনি রাক্ষস-পুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা।" স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাই, সগররাজ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। হরিবংশে দেখিতে

পাই জরাসন্ধের সেনাপতিত্বে বলবান্ বঙ্গাধিপতি, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, বলিবর পৌণ্ড্রাজ সুদূর মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। রুক্মিণীহরণকালেও পৌণ্ড্র ও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গরাজগণকে দেখিতে পাই। পৌণ্ড্রপতি 'পৃথিবীপতি' বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই পৌণ্ড্রপতিই একলব্যাদি সামন্ত নৃপতিবর্গসহ অগণিত বর্ত্তিকা হস্তে নিশার অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগের কথা—তারপর ঐতিহাসিকযুগে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে, বিজয়সিংহের সিংহল অভিযান বাঙ্গালীর অনন্যকীর্ত্তি। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রোম সম্রাট আগষ্টসের সভাকবি ভার্জিল তাঁহার জর্জ্জিকাসে লিখিয়াছেন, "আমি আমার জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি মর্ম্মর-মন্দির নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার তোরণশিরে হেম ও গজদন্তে গঙ্গারিডেদিগের বীরত্বকাহিনী লিখিয়া রাখিব।"

মৌর্য্য-পাল-সেন-যুগে বাঙ্গালীর পৌরুষ—মৌর্য্য-যুগে অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ একসূত্রে গ্রথিত হয়। মগধের গৌরব বাঙ্গালার গৌরব। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচ্ছেদে আমরা মৌর্য্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর যে "মাৎস্য-ন্যায়" যুগ আসে সে সময় আমরা বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই। মাৎস্য ন্যায় দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রজাপুঞ্জ রাজ-নির্ব্বাচন করে। বাঙ্গালার **পালবংশের** অভ্যুদয় এইরূপেই হয়। পালবংশের ধর্ম্মপালদেব উত্তরাপথ জয় করেন তনি "ইঙ্গিতমাত্রে" ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদিগকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করেন। ধর্ম্মপালের সৈন্যগণ "বঙ্গান্" বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালী ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপাল "একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ—একদিকে বরুণ নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদসমুদ্র) এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে ভোগ

করিতেন।” প্রথম পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর মহীপালদেবের বাহুবলে পুনরায় দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই বংশে রামপালদেব বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তারপর আসে বাঙ্গালায় **সেন রাজত্ব**। সেন রাজবংশের কীর্ত্তি বঙ্গ, মগধ, মিথিলা, উৎকল, কলিঙ্গ ও কামরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বংশে সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন বিশেষ প্রতাপশালী হ'ন। তিনি বঙ্গের বিক্রমাদিত্য আখ্যা লাভ করেন।

বাঙ্গালী ও মুসলমান-বিজয়—তারপর আসিল পাঠান বন্যা। পাঠান আসিল তাহার নবীন ধর্ম্মের জয় পতাকা উড়াইয়া। পাঞ্জাব বিজয়ের পর প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে বখ্‌তিয়ার পূর্ব্ব ভারতাকাশে উদিত হইল। অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ শুধু লুণ্ঠিত ও বিজিত হইল না, বৌদ্ধ ধর্ম্মও বিজিত হইল। উদ্দণ্ডপুর (বর্ত্তমান বিহার সরীফ) ও বিক্রমশীলার সঙ্ঘারামসমূহ ভস্মীভূত হইল। এ সময়ে **বঙ্গের সামাজিক অবস্থাও মুসলমান বিজয়ের অনুকূল হইয়াছিল।** সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, সমাজের অনুদারতা ও ধর্ম্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠিয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণপীড়নে ব্যতিব্যস্ত সদ্ধর্ম্মিগণ “যবন-রূপি” ধর্ম্মের আগমনে পরম পুলকিত হইয়াছেন, এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত “আনন্দেতে পরিল ইজার।” বিচারালয় তখন মর্য্যাদাশূন্য। লক্ষণসেনের দ্বিতীয়া মহিষী বল্লভা দেবী ও রাজ-শ্যালক কুমারদত্তের আচরণে প্রজারা তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে। ফলে হিন্দুর রাজ্য গেল, সমাজ টলিল, বহু হিন্দু এবং অধিকাংশ বৌদ্ধ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

পাঠান-বঙ্গে হিন্দুর প্রতাপ—পাঠান আমলে হিন্দু বীর্য্যবান্ ছিল। রাজা গণেশের ইতিবৃত্ত হইতে বুঝা যায়, পাঠান সুলতান হইলেও বাঙ্গালী ভূস্বামীগণ তখনও বাঙ্গালার প্রকৃত মালিক। পাঠানের গৌড়বিজয়ের পরে সুলতান ইলিয়াস্ শাহ, যিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন। কিন্তু হিন্দু বঙ্গের বিনা সহযোগীতায় স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিলেন। ফলে, ১৩৪৮ খ্রীঃ বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের

মিলন হইল। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ গৌড় সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস্‌কে দমন করিতে সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু জমিদারবর্গ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। এদিকে পূর্ব্ববঙ্গীয় অধিকাংশ হিন্দু জমিদার ইলিয়াস্ শাহের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রবাদ, দামনাশের **শিখাই সান্যাল** ও ভাজনীর **সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী** সুলতানকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শিখাই সান্যাল চলন বিলের দক্ষিণাংশ ও সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী চলনবিলের উত্তরাংশের জমিদারী লাভ করেন। শিখাই সান্যালের সান্যাল গড় "সাঁতোর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুবুদ্ধিরাম মাত্র একটাকা করিয়া কর দিতেন বলিয়া তাঁহার বংশ "একটাকিয়া" ভাদুড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইহা "একডালার" যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। এই যুদ্ধে সেনাপতি সহদেব এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধান্তে দিল্লীশ্বরের সহিত সুলতানের সন্ধি হয়। সুলতান যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে চট্ট-বংশাবতংশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলীনপ্রবর মহাধনী মনোহর পুত্র দুর্য্যোধনকে **"বঙ্গভূষণ",** এবং পূতিতণ্ড বংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণিকে **"রাজজয়ী"** উপাধিভূষিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরও স্বপক্ষীয় রাঢ়ীয় চট্টবংশীয় বিকর্ত্তন চট্টকে **"রাজা"** উপাধি ও শ্রীরাম চট্টকে **"খান"** উপাধি দিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটকেও একদিন গৌড় সুলতানকে দমন করিবার জন্য সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন নৃপতি **দনুজরায়ের** দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে বর্দ্ধমানের **মুকুট রায়ও** শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। পাঠানের দৌরাত্ম্যে বাধা দিতে গিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন। গৌড় সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি **গৌর মল্লিক** ত্রিপুরা জয় করেন এবং আসাম অভিযানেও "বঙ্গাল" নামক একজন সেনানায়কের নাম পাওয়া যায়।

শের খাঁ যখন পাঠান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার কল্পে অস্ত্রধারণ করেন তখন বলিয়াছিলেন যে, **"ভগবানের কৃপায় যদি বঙ্গ-সৈন্য পরাজিত করিতে পারি,** তাহা হইলে মোগলদিগকে ভারত হইতে অক্লেশেই তাড়াইয়া দিব"।

মোগল-বিজয় ও বাঙ্গালার দ্বাদশ আদিত্য—তারপর আসিল মোগল। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রতীতি হইল বাস্তবিকই বাঙ্গালীরা কামান চালনায় সিদ্ধহস্ত।" মোগলের আগমনের পরই গৌড় মহামারীতে ধ্বংস হইয়া গেল। বাঙ্গালার সামরিক শক্তি **দ্বাদশ ভুঁইয়ার** মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁ, কন্দর্প রায়, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দরায়, কেদার রায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, চাঁদগাজী, ফজলগাজী প্রভৃতি বাংলার দ্বাদশ ভূঁইয়া দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করিত না।

যখন যোধপুর ও বিকানীর আকবর শাহকে প্রত্যেকে ৫০,০০০ পদাতিক দিত—তখন বাঙ্গালার ফতেহাবাদ সরকার (ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত দ্বীপাবলী) ৫০,৭০০ পদাতিক ও ৯০০ অশ্বারোহী, সোণার গাঁ (বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি) ৪৬,০০০ পদাতিক ও ১৫০০ অশ্বারোহী, বাজুহা (রাজসাহী, বগুড়া পাবনা এবং ঢাকার কিয়দংশ) ৪৫,৩০০ পদাতিক ও ১৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুরের অংশ, রংপুর ও বগুড়া) ৩২,৬০০ পদাতিক ও ৯০০ অশ্বারোহী, বাকলা (বাখরগঞ্জ ও ঢাকা) ১৫,০০০ পদাতিক ও ৩২০ অশ্বারোহী সরবরাহ করিত। বর্দ্ধমান, হুগলি, ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি প্রত্যেকে ৫০০০ পদাতিক সরবরাহ করিত।

বর্গীর হাঙ্গামা ও বাঙ্গালা—মোগলের অধঃপতনে বর্গীর প্রাবল্য দেখা দিল। আলীবর্দ্দীর বাঙ্গালী সৈন্য বর্গীদিগকে কিরূপ দমিত রাখিয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। বর্দ্ধমানের শোভাসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই লক্ষাধিক বাঙ্গালী বিদ্রোহী-সেনা একত্র সমবেত হইয়াছিল। ইহাতে বাঙ্গালার সামরিক মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরাজের প্রথমযুগে বাঙ্গালী—তারপর আসিল ইংরাজ। অন্ধকূপ হত্যার পর ইংরাজ-সেনাপতির অধীনে যে সিপাহী সৈন্য বজবজ হইতে কলিকাতা অভিযান করে তাহাতে বহু বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। পলাশীক্ষেত্রে যে সিপাহী **'লাল পল্টন'** ক্লাইভকে বিজয় দান করে তাহাতেও ছিল বাঙ্গালী সৈন্য। বিশ্বস্ত বাঙ্গালী-বীর মোহনলালের কীর্ত্তি পলাশীক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি। বাঙ্গালী কেবল কামান চালনা করিত তাহা নহে, কামান প্রস্তুত করিতেও পারিত। কলিকাতা ও কাশীমবাজার অবরোধের সময় নবাবী সৈন্য য়ুরোপ হইতে আনীত কোম্পানীর কতকগুলি ফিল্ডপিস্ দখল করিয়াছিল। নবাব সেই ফিল্ডপিস্গুলির অনুকরণে ২০টি এমন সুন্দর কামান বাঙ্গালী কর্ম্মকার-দিগের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে উভয় কামানগুলি একস্থানে রাখিলে আসল নকল বুঝা কঠিত হইত। নবাবের বাঙ্গালী মিস্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মিত অনেক বড়, আকারের কামান ছিল। সেকালে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে যে সকল কামান নির্ম্মিত হইত ইংরাজগণ তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

Martial Raceএর (সামরিক জাতির) নিদান—তারপর ইংরাজ আমলের দ্বিতীয় যুগ। মেধাবী বাঙ্গালীর হস্তে সমরাস্ত্র দিতে ইংরাজ ভীত হইল। সিপাহী আসিল বেহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতনার ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের মধ্য হইতে। সিপাহীযুদ্ধের পর দেখিলাম "ব্রাহ্মণ" সিপাহীরাই আবার বাঙ্গালীর ন্যায় non-martial raceএর পর্য্যায়ে পড়িল। তাহাদের সামরিক জাতিচ্যুতির প্রথম কারণ ছিল সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে তাহাদের দেশ ও স্বজনের উপর ইংরাজ এমন অমানুষিক অত্যাচার করিল যে তাহাদের দ্বারা উত্তরকালে বৈর-নির্য্যাতনের ভয় রহিয়া গেল। শিখেরা সিপাহী যুদ্ধের সময় বিশেষ সাহায্যে আসিয়াছিল। অতএব ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত খুব বাড়িয়া গেল। "ব্রাহ্মণ" পদবীধারী মাত্র একটি ক্ষুদ্র সেনাদল আজকাল বর্ত্তমান আছে। এদিকে শিখদের আদর তাহাদের দেশপ্রাণতার অনুপাতেই

হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমানের স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন (favourite) হইতেছে পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য। সমগ্র ভারতীয় বাহিনীর তাহারা অর্দ্ধাংশেরও অধিক। অতএব দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে martial race সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, বাঙ্গালীর তথাকথিত সামরিক প্রতিভাহীনতা এজন্য কোনরূপেই দায়ী নহে। সিপাহীযুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তীকালের ভারতের সামরিক ইতিহাসে দেখা যায় বাঙ্গালী বারংবার তাহার সামরিক শক্তির বহু নিদর্শন দিলেও ইংরাজ তাহার বাহুবল উপেক্ষা করিয়া মস্তিষ্ক বলের সাহায্য লইতে সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার সকল যুদ্ধেই বাঙ্গালী রসদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্রধারণের অনুমতি পায় নাই।

য়ুরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী—তারপর আসিল ১৯১৪ সালের য়ুরোপীয় মহাসমর। সমরাঙ্গনের বার্ত্তা বাঙ্গালীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সর্ব্বপ্রথম ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে বাঙ্গালী রণসাজে সজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনাভিমুখে রওনা হইল। ইংরাজরাজ অবশেষে কুণ্ঠিতচিত্তে বাঙ্গালী পল্টন গঠনের অনুজ্ঞা দিলেন। বহুকাল পরে বাঙ্গালী রণসাজে সাজিল। ফরাসী চন্দননগরের বাঙ্গালী সেনা য়ুরোপ ভূখণ্ডে প্রেরিত হইল এবং কামান চালনার ভার পাইল। কলিকাতার বাঙ্গালী পল্টন প্রেরিত হইল মেসোপটেমিয়া, কূট ও বগ্দাদে। বাঙ্গালী রণদাপ্রসাদ স্বকীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া কিরূপে আর্ত্তনিবাসস্থ আহত ইংরাজ সেনাগণকে লেলিহান অগ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা শৌর্য্যের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বাঙ্গালী সৈনিকের এরূপ শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের উদাহরণ বিরল নহে। একদা তুর্কী নিক্ষিপ্ত একটি বোমা একটি "হস্পিটাল" পোতে আসিয়া পতিত হয়। বোমার মুখে অগ্নি জ্বলিতেছিল—উহা ফাটিবার বিলম্ব ছিল না। এমন সময় মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া একজন বাঙ্গালী প্রাইভেট সেই প্রজ্বলিত বোমা তুলিয়া লয় এবং নিমেষে উহার প্রজ্বলিত পলিতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। বিগত মহাসমরের সময় বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী ৪৮ দিনে গঠিত হইয়াছিল।

এই বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী সম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট মিল লিখিয়াছেন—"ইহারাই আমার সেনাদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাদল।" বাঙ্গালীদের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীদের মত আমাদের সকল রেজিমেণ্টগুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।" সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যুদ্ধবিদ্যায় বাঙ্গালী কাহারও অপেক্ষা ন্যূন প্রমাণিত হইবে না।

দ্বিতীয় মহাসমর—এই মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যদল গঠনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই, যদ্যপি বহু বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনীর নানা প্রকার কার্য্যে যোগ দিয়াছে এবং শিক্ষিত শ্রেণী হইতে অনেকে King's Commission বা Viceroy's Commission পাইয়া অফিসার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বহু বাঙ্গালী যুবক বিমান চালকের বিপজ্জনক কার্য্যে সানন্দে ও স্বেচ্ছায় যোগ দিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়

তক্ষশীলা—বাঙ্গালার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়—নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল প্রভৃতির সহিত ভারতের অন্যপ্রান্তস্থিত বারাণসী, তক্ষশীলা, অজন্তা, বল্লভীর নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।

তক্ষশীলা সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। প্রাচীন হিন্দুযুগেও ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। **বঙ্গদেশাগত ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত**। এখানে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শাস্ত্রেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানকার অস্ত্রবিদ্যার চিকিৎসক আত্রেয় মাথার খুলি তুলিয়া শল্য চালনা করিয়া আবার তাহা জুড়িয়া দিতে পারিতেন। মগধের **জীবক** তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। একদিন আত্রেয় পরীক্ষাচ্ছলে ছাত্রদের বলিলেন, "নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে এমন একটি গাছ লইয়া আইস যাহা ঔষধার্থে কোন প্রয়োজনে আসে না।" বহু ছাত্র বহু লতা বৃক্ষ লইয়া আসিল, জীবক শূন্য হস্তে ফিরিল। অধ্যাপকের প্রশ্নে ধীমান্ ছাত্র উত্তর দিল, "ঔষধে প্রযোগ হয় না এমন গাছ পাইলাম না।" সেকালে ধনাঢ্য ছাত্রেরা প্রচুর গুরুদক্ষিণা দিত, গরীব ছাত্রেরা বিনামূল্যে পড়িত। পঞ্চম শতাব্দীতেও তক্ষশীলা বর্ত্তমান ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্ সাংও ইহাকে গৌরবান্বিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। রাওলপিণ্ডির নিকট দ্বাদশ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে উহার ধ্বংসস্তূপ বাহির হইয়াছে। খনন-কার্য্য এখনও চলিতেছে। তক্ষশীলা ভারতীয় সকল বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে প্রাচীন।

নালন্দা—রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বর্ত্তমান বড়গাঁও নামক গ্রামের দক্ষিণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। নালন্দা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ বলেন নালন্দা মঠটি যে আম্রকুঞ্জে অবস্থিত ছিল তাহার নিকটে ইন্দ্রপুকুর

নামক একটি পুকুরে নালন্দা নামে একটি নাগ বাস করিত। তাহার নামে নালন্দা বিহারের নামোৎপত্তি হয়। অনেকে বলেন সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্বরূপে এখানে তপস্যা করিতেন। তিনি গরীব দুঃখীদিগকে মুক্তহস্তে সমস্তই বিলাইয়া দিতেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম 'না-অলম-দা' বা নালন্দা—মুক্তহস্তে সমস্ত বিলাইয়াও যাহার তৃপ্তি হয় না, সেই রাজার দেশ। **সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ইহা স্থাপিত হয়।** নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব প্রভৃতির প্রতিভা ইহার ভবিষ্য প্রতিষ্ঠালাভের সোপান হইয়াছিল। ফাহিয়ান চতুর্থ খৃঃ আসিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠার পথে দেখেন। ১১৯৭ খৃঃ মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। একটি চতুর্ভুজ আয়ত বৃহৎ ও সুন্দর বাগানের মধ্যে ছয়টি বৃহৎ অট্টালিকায় প্রায় **দশ হাজার ছাত্র এখানে বাস করিত।** চারিদিকে মন্দির, বিহার, স্তূপ, পাঠাগার ও বড় বড় দিঘী ও সরোবর ছিল। রত্নোদধি নামক একটি নয়তালা উচ্চ বাটীতে ইহার পুঁথিশালা স্থাপিত ছিল। তিব্বতীয়েরা বলে হিন্দু ভিক্ষুরা ইহা নষ্ট করিয়াছে। নালন্দায় দশ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। ছাত্রাবাসের জন্য অনেকগুলি চারিতলা বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধ্যাপনাগৃহের সংখ্যা ছিল দশটি, প্রত্যেকটি গৃহ ত্রিশ ফিট উচ্চ ছিল। ইহা ছাড়া আটটি হলঘর ছিল—তাহাতে ৩০০টি গৃহ ছিল। বিদ্যালয়ের চারিদিক বেড়িয়া বারান্দা ছিল। ঘরে ঘরে নানা মূর্ত্তি থাকিত। নরসিংহ গুপ্ত এখানে একটি ৩০০ ফুট উচ্চ মণিমুক্তাখচিত ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর দিকে ৮০ ফুট উচ্চ তাম্রনির্ম্মিত একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সহজে প্রবেশাধিকার পাইত না। দ্বারে দ্বারপাল পণ্ডিতগণ থাকিতেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে প্রবেশাধিকার লাভ হইত। পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে শতকরা ২০ জন ছাত্রের বেশী উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। ছাত্রেরা প্রত্যহ প্রাতে ঘণ্টাধ্বনির

সহিত গাত্রোত্থান করিয়া একশত করিয়া প্রত্যেক দলে বিভক্ত হইয়া স্নান করিতে যাইত। পরে অধ্যাপনাগৃহে গমন করিত। সারাদিন অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। ছাত্রদিগের নিকট কোন দক্ষিণা লওয়া হইত না। রাজারা অর্থসাহায্য করিয়া সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যেক ছাত্র বাস করিবার ও পড়াশুনা করিবার ঘর পাইত। আহারের জন্য সুগন্ধি তণ্ডুল, জাম্বির ফল, খেজুর, জামফল, সুপারি-কর্পূর প্রভৃতি পাইত। হিউ-এন্-চাঙ প্রতিদিন ২২০টী জাম্বির ফল, ২০টী জামফল, ২০টী খেজুর, আড়াই তোলা কর্পূর, কিছু মাখন, এক পোয়া চাউল ও তিনরাশি তৈল পাইতেন। নালন্দার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাঙ্গালার পালরাজ দেবপালদেব মগধ জয় করিয়া নালন্দাও লাভ করেন। **দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দা পালগণের অধিকারে ছিল।** তাঁহারা নালন্দার যথেষ্ট উন্নতি করেন। নালন্দার ধ্বংসস্তূপে হিন্দু দেবদেবীর ও বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় হিন্দুযুগেও নালন্দা বর্ত্তমান ছিল।

নালন্দা হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপন করেন। নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মহাচার্য্য আর্য্যদেব, ধর্ম্মপাল (দাক্ষিণাত্যবাসী), আচার্য্য শিলভদ্র (বাঙ্গালী), চন্দ্রগোমিন (বাঙ্গালী), পদ্মসম্ভব, শান্তরক্ষিত (বাঙ্গালী), বুদ্ধকীর্ত্তি, কর্ণ শ্রী, সুমতি সেন, কর্ণপতি, মহাযোগীন, কুমারশ্রী এবং স্থিরমতি। ইহাদের সকলেই তিব্বতীয়দিগের নিকট পরিচিত ছিলেন এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারহেতু তিব্বত গিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলা—ভাগলপুর জেলার কহলগাঁওর নিকট পাথরঘাটায় শ্রীবিক্রমশীলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল। পাথরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশীলা। পালবংশীয় বাঙ্গালী রাজা ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল এই বিহারের গঠন পরিকল্পনা করেন।

ইহার কক্ষগুলি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত হয়। এই মহাবিহারের আদর্শে তিব্বত-বাসীরা তাঁহাদের সঙ্ঘারাম সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং তন্মধ্যে ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৯ জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও ছয়টি উচ্চপদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজদরবার হইতে তাঁহারা সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতেন। এই বিহারে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল—তাঁহারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরিদর্শন ভার পাইয়াছিলেন। নরপতি ধর্ম্মপাল বিক্রমশীলা বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এই বিহারে ৮০০০ ব্যক্তি একসঙ্গে বসিয়া আচার্য্যগণের উপদেশ লাভ করিতেন। রাজা ধর্ম্মপালের সময় এখানকার অধ্যক্ষ বা মহাস্থবির ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। বিক্রমশীলার খ্যাতনামা অধ্যাপকদিগের মধ্যে আচার্য্য রত্নাকর শান্তি, জেতারি (বাঙ্গালী) প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নবজ্র, বৈরোচন রক্ষিত, জ্ঞানশ্রী মিত্র (গৌড়), আচার্য্য শ্রীধর, ভব্যকীর্ত্তি, নীলবজ্র, তথাগত রক্ষিত (উড়িষ্যা), কমল রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত (বাঙ্গালী), শাক্যশ্রী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (বাঙ্গালী) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নালন্দার ন্যায় এখানেও দ্বারপণ্ডিত থাকিতেন। তাঁহাদিগের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইত না। বিক্রমশীলার ছয়টি প্রবেশ দ্বার ছিল। এক সময়ে দক্ষিণদ্বারে থাকিতেন প্রজ্ঞাকরমতি, উত্তরদ্বারে নরোপা, পূর্ব্বদ্বারে রত্নাকর শান্তি, পশ্চিম-দ্বারে বাগীশ্বর কীর্ত্তি, মধ্যদ্বারে রত্নবজ্র এবং দ্বিতীয় মধ্যদ্বারে জ্ঞানশ্রী মিত্র। তাঁহারা প্রত্যেকেই অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। নালন্দার ন্যায় এখান হইতে পণ্ডিতগণ তিব্বত গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। বিক্রমশীলা তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল।

চারিশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় তাহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-

ছিল। ১২০৩ খৃঃ পণ্ডিত শাক্যশ্রী যখন এই বিহারের অধিনায়ক ছিলেন, তখন তুরস্ক সেনাগণ কর্ত্তৃক ইহা ভস্মীভূত হয়। ফলে অনেক পণ্ডিত পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং তিব্বতে পলায়ন করেন। জ্যেষ্ঠ রত্নরক্ষিত নেপালে ও জ্ঞানকর গুপ্ত প্রভৃতি বড়-পণ্ডিত ও এক শত ক্ষুদ্র-পণ্ডিত দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে চলিয়া যান। দক্ষিণ দেশে ও অন্যান্য স্থানে আরও তিন শতাধিক পণ্ডিত পলায়ন করেন।

উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুর—উদ্দণ্ডপুর-বিহার বিক্রমশীলা হইতে আরও কিছু প্রাচীন। ইহাই বোধ হয় বর্ত্তমান 'বিহার শরীফ'। পালরাজত্বের বহুপূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও পালবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সঙ্ঘারাম উদ্দণ্ডপুর নগরের গিরিশীর্ষে অবস্থিত এবং দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত ছিল। ইহাতে প্রায় সহস্রাধিক ভিক্ষু বাস করিতেন। বখ্‌তিয়ার মগধ আক্রমণ করিলে পালরাজ গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া এই বিহারে আশ্রয় লন। মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সকলই বিফল হয়। এই বিহারের আশে পাশে বিজেতার হাত হইতে এমন একটি বৌদ্ধ বা হিন্দু পরিত্রাণ পান নাই যিনি বলিয়া দিতে পারিতেন যে 'বিহারের' রাশি রাশি পুস্তকে কি লিখিত আছে। তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক সমস্ত বিহার ভস্মীভূত হয়।

জগদ্দলবিহার—এই বিহার পালবংশীয় নরপতি রামপাল (১০৮৪—১১৩০ খৃঃ) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপালচরিতে জগদ্দল মহাবিহারের কথা আছে। রাজা রামপাল বরেন্দ্রভূমে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নামে নগরী স্থাপন করেন। সেখানেই জগদ্দল মহাবিহার নির্ম্মিত হয়। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "মুন্সিগঞ্জে রামপাল নামক যে এক পুরাতন গ্রাম আছে, হয়ত সেইই রামাবতী এবং জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে।" এই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যূন এক শত বর্ষ জীবিত ছিল।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত নন। তাঁহারা বলেন জগদ্দল বিহার বরেন্দ্রীর অন্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। বঙ্গে তুর্কী অভিযানের সহিত (১২০৩ খৃঃ) ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, রাজা রামপালের পূর্ব্ব হইতেই এই বিহার বর্ত্তমান ছিল।

এখানে অনেক তিব্বতীয় ছাত্র বিদ্যালাভ করিতেন। জগদ্দল বিহারের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভঙ্কর, মোক্ষকর গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান। বিভূতিচন্দ্র তিব্বতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহার—পালযুগে আরও কয়েকটী বৌদ্ধ বিহারের সংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে, ত্রৈকূটক বিহার (রাঢ়), দেবীকোট (উত্তর বঙ্গ), পণ্ডিতা (চট্টগ্রাম), ফুল্লহরী (পশ্চিম মগধ), সন্নগর (পূর্ব্বভারত), পট্টিকের (কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী পাহাড়) ও বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর)।

বারাণসী—দুই হাজার বৎসর যাবৎ কাশী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। কাশী তক্ষশীলা হইতে আধুনিক। আর্য্যরা একদিন কাশীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অথর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে—"আমাদের দেশের এ জ্বর জ্বালা কাশী ও মগধে যাউক।" খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও দেখি কাশীর রাজারা তাঁহাদের পুত্রগণকে শিক্ষার নিমিত্ত তক্ষশীলায় পাঠাইতেছেন। বুদ্ধদেবের সময়ে কাশী বিদ্যাপীঠরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ যুগে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ যে একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী পণ্ডিতরাই পুনরায় কাশীকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

বল্লভী ও অজন্তা—পশ্চিম ভারতে বল্লভীতে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ইহার খ্যাতি নালন্দার সমতুল্য হইয়াছিল। উহাতে একশত বৌদ্ধ বিহার ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্র সমভাবে সেখানে শিক্ষালাভ করিত।

অজন্তা আজ তাহার চিত্রাবলীর জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ইহাতে যে এক সময়ে একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহাতে ২৯টি গুহা আছে, যাহার গাত্রে, ছাদে, স্তম্ভে, ও দ্বারদেশে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

মিথিলা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া—

এইগুলি মুসলমান রাজত্বের সময় বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। **মিথিলা** বখ্‌তিয়ারের গৌড়-মগধ বিজয়ের বহুদিন পরেও স্বাধীন ছিল। বাঙ্গালার বহু ছাত্র মিথিলায় **দর্শনশাস্ত্র** অধ্যয়ন করিতে যাইত। মিথিলার পণ্ডিতরা গৃহগামী বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি কাড়িয়া লইতেন, যাহাতে না মিথিলার ন্যায়-দর্শন বাঙ্গালাদেশে অধ্যাপিত হয়। কিন্তু এ অত্যাচার বহুদিন টিকিল না। পক্ষধর মিশ্রের একটি বাঙ্গালী ছাত্র জুটিল, যিনি শুধু গুরুকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু সমগ্র ন্যায়-দর্শন কণ্ঠস্থ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিলেন। মিথিলার পণ্ডিতরা যখন **রঘুনাথ শিরোমণির** পুঁথিপাথি কাড়িয়া লইয়া নিশ্চিন্ত মনে আছেন, এমন সময় একদিন শুনিলেন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি লিখিত হইয়াছে, অধ্যাপনাও চলিতেছে। এইরূপে বাঙ্গালীর ধীশক্তির কাছে মিথিলার প্রভুত্ব চিরতরে লোপ পাইয়াছিল।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে **নবদ্বীপে** ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত, এখন তাহা অর্দ্ধ সহস্রে নামিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালার ছাত্র অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপে আসিত। অধ্যাপনার নিমিত্ত অসংখ্য "টোল" ছিল। অধ্যাপক দক্ষিণা লইতেন না। অধিকন্তু ছাত্রের বাসস্থান ও আহার্য্য যোগাইতেন। রাজা ও ভূস্বামিগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে পণ্ডিত বিদায় দ্বারাও

কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত। সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবস্থাদান দ্বারাও কিছু উপার্জ্জন হইত। সেকালে অধ্যাপক গৃহিণী এক জোড়া শাঁখা ও লালপেড়ে শাড়িতেই সন্তুষ্টা থাকিতেন। অধ্যাপক ভক্তিপূর্ব্বক গৃহ-দেবতাকে উদ্দিষ্ট শাকান্ন প্রসাদেই পরমানন্দ লাভ করিতেন। এই পণ্ডিতগণই হিন্দুরাজাদের মন্ত্রী ছিলেন। হিন্দুরাজত্বের পতন হইলে, পণ্ডিতরা রাষ্ট্র-ব্যবহার-কর্ত্তার পরিবর্ত্তে সমাজ-ব্যবহার-কর্ত্তা হন। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা দেশ শাসনে ইহাদের সাহায্য লইতেন।

ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে বহু পণ্ডিতের "টোলে" আজও অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করে। **ভট্টপল্লী** সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধপুরুষ ৺নারায়ণ ঠাকুরের সময় হইতে রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ (ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা), জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (ইনি ত্রিবেণীর নহেন), জনার্দ্দন বাচস্পতি, হলধর তর্কচূড়ামণি, নিমাই তর্কপঞ্চানন, যদুরাম সার্ব্বভৌম, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তারাচরণ তর্করত্ন, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভট্টপল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে কোটালিপাড়া এক সময়ে অধ্যাপনার কেন্দ্র হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনা কার্য্য দ্বারা প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন।

ইংরাজ আমলে শিক্ষা বিস্তার—ইংরাজ আগমনে প্রাচ্য শিক্ষার আদর কমিয়া গিয়াছে, অর্থকরী পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ-ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমপর্ব্বে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রভৃতিকে প্রাচ্য বিদ্যার উন্নতিকল্পে কলিকাতা-মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিতে দেখি। প্রাচ্য বিদ্যার প্রসার জন্য বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্ব্বে দেখি, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার প্রয়াসী খৃষ্টান পাদ্রীরা স্কুল কলেজ স্থাপন করিতেছেন। কেরি, মার্শমান, ওয়ার্ড, এলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি

উঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। এই যুগে দেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহারই চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপিত হয়। এই সময় প্রাচ্য-বনাম-পাশ্চাত্য শিক্ষা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ হয়। মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহারই অভিমত শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল।

শিক্ষার ইতিহাসে তৃতীয় পর্ব্বের আরম্ভ হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত **Despatch** হইতে। এই **Despatch**এ তদানীন্তন ভারত সচিব বড়লাট লর্ড ড্যালহাউসীকে এই কয়টি উপদেশ দেন—(ক) পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবে, (খ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে, (গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং সেগুলিকে উপযুক্ত ও নিয়মিত সাহায্য দিবে, (ঘ) স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮৫০ খৃঃ কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ১৮৮৭ সালে পঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এক সময় সমগ্র উত্তর ভারত—পঞ্জাবের পূর্ব্ব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। বাঙ্গালা তথা ভারতে ইংরাজী বিদ্যার দ্রুত প্রসার দেখিয়া মনস্বী সার্ হেন্‌রি মেন্ বলিয়াছিলেন, "মধ্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ দ্রুত প্রসার দেখি নাই।" এই উন্নতি দেখিয়াও ইংরাজ সরকার শিক্ষা প্রসারকল্পে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের নির্দ্দেশমত শিক্ষা-বিস্তার-চেষ্টা বে-সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেন। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে ১৮৩৫ খৃঃ যেখানে বাঙ্গালায় মোট ৮০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল, ১৯৪০ খৃঃ তাহা হ্রাস পাইয়া ৬০,০০০ দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ-আমলের গত শতবর্ষে ভারতে শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসার লাভের পরিবর্ত্তে সঙ্কুচিতই হইয়াছে। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভের যে অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় ইহা ভারতের মজ্জাগত চিরন্তনী প্রবৃত্তি—নবজাত অনুরাগ নহে।

চতুর্থ পর্ব্বে দেখি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-সংস্কার-প্রয়াসী হইয়াছেন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়-আইন, ও পরবর্ত্তীকালের সাড্‌লর কমিশন নিয়োগ এই প্রচেষ্টার নিদর্শন।

বর্ত্তমান শিক্ষায়তনগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কালেজিয় ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা-কেন্দ্র মাত্র ছিল। বাঙ্গালার নরব্যাঘ্র সার্ আশুতোষ ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। আজ সর্ব্বত্র তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে দারুণ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ সালের বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকায়ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সার্ আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার শিক্ষা জগতে আর একটি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে এই সাধু প্রচেষ্টার অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমানে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, যথা,—পাটনা, ঢাকা, রেঙ্গুণ ও এলাহাবাদ। শেষোক্তটি হইতে আলিগড়, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। নাগপুরও একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। দানশৌণ্ড তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় কলিকাতা সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। দারভাঙ্গা বিল্ডিংস্, আশুতোষ হল, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, সিনেট হাউস্ প্রভৃতি অট্টালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। আইন কলেজ, সায়েন্স কলেজ, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কলা বিভাগ প্রভৃতি সার্ আশুতোষের কীর্ত্তি। বর্ত্তমানে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি শিক্ষণীয় বিভাগ আছে, উহাতে ২৫৫ জন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ ৩৭।৩৮ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী সাহায্য মাত্র পাঁচ লক্ষেরও কম। সার্ আশুতোষের স্মরণার্থে সম্প্রতি একটি মিউজিয়ামও (যাদুঘর) স্থাপিত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে ইহার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি Residential University হইলেও বাহিরের ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে পারে। এখানেও বহু কৃতবিদ্য অধ্যাপক শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন।

সেকালের সমাবর্ত্তন অভিভাষণ—একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি-বিতরণী সভায় অভিভাষণ-দান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় দাঁড়াইয়াছে। আজকাল প্রায় প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই সমাবর্ত্তন অভিভাষণ দিবার জন্য বাহির হইতে মনস্বী ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। এই সকল অভিভাষণে সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য ও ছাত্রদের প্রতি উপদেশ থাকে।

নিম্নে আমরা সেকালের অধ্যয়ন শেষে গুরু-গৃহত্যাগী শিষ্যের প্রতি গুরুর বিদায় উপদেশ বাণীর পরিচয় দিতেছি।

সত্যংবদ, ধর্ম্মংচর, স্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ।
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যচ্ছেৎসীঃ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্, স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব, আচার্য্যদেবোভব, অতিথিদেবোভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপস্যানি নো ইতরাণি।
যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনে নে প্রশমিতব্যম্।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্, শ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়াদেয়ং, সংবিদা দেয়ম্
অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ,
যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ
যুক্তাঃ অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্
তে তত্র তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ
অথাভাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ,
যুক্তা অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ
যথা তে তেষু বর্ত্তেরন তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ
এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষাবেদোপনিষৎ, এতদনুশাসনম্।
এবমুপাসিতব্যং এবমু চৈতদুপাস্যম্।
—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

বাঙ্গালা অনুবাদ—সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদ-অধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা দানান্তে গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায়াবলম্বন করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ত্বলাভে ঔদাস্য করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। পিতাকে দেববৎ পূজা করিবে, মাতাকে দেবতাবৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা করিবে। অতিথিকে দেববৎ পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে ; অন্য অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে না। আমাদের যে সকল সৎ সে সকলই তোমার কর্ত্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসন দানাদি দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে।

লজ্জা অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। যদি তোমার কর্ম্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্ম্মকাম, অন্যকর্ত্তৃক যাগাদি কর্ম্মে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সে বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্ম্মকাম, অন্যকর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে সেরূপ আচরণ করিবে। ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ। ইহাই বেদার্থ। ইহাই অনুশাসন। এরূপ আচরণ কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহা পালন করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর নৌ-শিল্প

"একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত, ভ্রমিল ভারত সাগরময়"—দ্বিজেন্দ্রলাল

বাঙ্গালায় বড় বড় নদ নদী থাকায় প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে নৌ-শিল্পের উন্নতি হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালায় নৌ-শিল্পের প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম কথা পাই খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের আখ্যায়িকা হইতে। তাঁহার একটি নৌকায় বা জাহাজে সাত শত অনুচরের স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল।

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্র বলে যে, যিনি রাজার "নাবধ্যক্ষ" থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রসংযানের"ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ-মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ-মগধ হইতে জাহাজে যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও ছিল না। খৃঃ জন্মের পূর্ব্বে লিখিত দশকুমারচরিতে তাম্রলিপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফা হিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে একটি জাহাজে উঠিয়া চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিং চীন হইতে সমুদ্রপথে আসিয়া এখানেই অবতরণ করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তি হইতে চীন, জাপান, সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীর জাহাজে যাইত। মগধবাসীর একাধিকবার বর্ম্মা অধিকার করিবার কথাও পাওয়া যায়। কালিদাস বাঙ্গালার নৌবাটের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

পালরাজবংশীয় রামপালকে নৌকাসেতু (নৌ-মেলক) নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গা পার হইতে দেখা যায়। "মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর" পুঁথিতেই আমরা বাঙ্গালাদেশের নৌযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই। বণিকরা গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ সদাগরের প্রধান জাহাজ 'মধুকরের' ১২০০ দাঁড় ছিল।" জাহাজের নামের মাধুর্য্যও বেশ দেখা যায়, কাহারও কাহারও নাম ছিল, "রাজহংস", "সমুদ্রফেনা", "উদয়তারা", "গঙ্গাপ্রসাদ", ইত্যাদি।

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত "Indian Shipping" পুস্তকে বাঙ্গালার প্রাচীন নৌ-শিল্পের সুখপাঠ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। তুরস্কের সুলতান বাঙ্গালায় নির্ম্মিত অর্ণবপোত মজবুত, সুদৃশ্য ও সস্তা বলিয়া ক্রয় করিতেন।

পাঠান বিজয়ের পর বাঙ্গালার নৌবলের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। তারপর বারভূঁইয়ার যুগে আবার বাঙ্গালায় রণতরী ও জল-যুদ্ধের গৌরবের কথা শুনিতে পাই। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতির বহু রণতরী ছিল এবং তাঁহারা মোগলের সহিত জলযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেদার রায় ৫০০ শত যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া মানসিংহের সহিত বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের সাহায্য ল'ন। এই পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা ও মগেরা দক্ষিণ বাঙ্গালা উৎসন্নে দিয়া সুন্দরবন সৃষ্টি করে। সায়েস্তা খাঁর ঢাকাই নৌবহর একদিন একদিকে এই মগ ও অন্যদিকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমিত রাখিয়াছিল। মাত্র ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী অর্ণবপোত প্রস্তুত হইয়াছে। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত জাহাজের মালিকগণের নাম দেওয়া গেল, যথা, মদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী, গুমানি মালুম প্রভৃতি। ইঁহাদের অনেকের শতাধিকও জাহাজ ছিল। পর্ত্তুগীজ দস্যু যাহারা "হার্ম্মাদ" নামে কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল (আরমাডা

হইতে হার্ম্মাদ শব্দের উৎপত্তি) তাহারাও এই সকল "বহরদার"কে ভয় করিত। রামমোহন দারগা নামক নাবিকের জাহাজ স্কটলণ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল।

আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, "ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশে * * * * এবং ঢাকা প্রদেশেই ভাল ভাল নৌকা তৈয়ারী হয়। পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গালাদেশেই তৈয়ারী হইত। বাদশাহ বহু অর্থব্যয় করিয়া জাহাজী কারিকরদিগকে এলাহাবাদে ও লাহোরে আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন।"

প্রাচীনকালে জলযান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত—সামান্য এবং বিশেষ। "সামান্য" যানগুলি নদীপথে ও "বিশেষ" যানগুলি সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত। পোত নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিভাগে বিভক্ত হইত। এই সকল পোত বাণিজ্যার্থে এবং যুদ্ধার্থে দুই কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ভোজ সমুদ্রগামী পোতের তলদেশের কাষ্ঠ লৌহ দ্বারা বদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া দেন, কারণ নিমজ্জমান শৈলের চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া কাষ্ঠ চূর্ণ করিতে পারে। তিন প্রস্থ কাষ্ঠ দ্বারা পোতের তলদেশ প্রস্তুত হইত। বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্য্যস্ত হইলে, নির্ম্মাণ-কৌশলের গুণে উহা রক্ষা পাইত। ভারতবর্ষের সহিত দিগদর্শন-যন্ত্রের পরিচয় অতি সুপ্রাচীন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতে মুসলমান অধিকার আরম্ভ হইয়াছে এবং নানা কারণে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে (পৃ ৭১)। ডাঃ বুলার লিখিয়াছেন **খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না।**

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর উপনিবেশ

বৃহত্তর ও মহত্তম বঙ্গ

"সন্তান যার তিব্বত চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ
তুই না গো মা তাদের জননী, তুই না গো মা তাদের দেশ।"

প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ—খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যে দিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে দুইটি শালগাছের মধ্যে শয়ন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালী বিজয় সিংহ লঙ্কা দ্বীপে অবতরণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩ শতকে সেলুকস্ প্রেরিত মেগাস্থিনিস্ গৌড়ের বহির্ব্বাণিজ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীস্, রোম, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী সওদাগরগণ বঙ্গের পণ্যসম্ভার লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। কতিপয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রোমের সম্রাটের নিকট তৎকালীন বঙ্গাধিপের পত্র ও উপঢৌকন লইয়া গিয়া ছিলেন। বোগ্দাদের খলিফাগণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকার্য্য-খচিত শিল্প সামগ্রীর দ্বারা সজ্জিত হইত। গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্ত দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বাঙ্গালী দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কনক সহায় পিলে, "অষ্টাদশ-শত বর্ষ পূর্ব্বের তামিলগণ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তামিল নাম তাম্রলিপ্তি হইতে আসিয়াছে। তামিল ভাষায়ও বহু বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যায়।

চীন, জাপান, ব্রহ্মে বাঙ্গালী উপনিবেশ—খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যক্ষ নামে অশোকের এক বিদ্রোহী মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া সাত শত অনুচরসহ চীনের কোন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হ'ন। আর এক সময়ে চীনের লো-ইয়ং প্রদেশে তিন সহস্র

ভারতবর্ষীয় প্রচারক এবং দশ সহস্র ভারতবাসী সপরিবারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন ও স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বহুলোক বাঙ্গালী ছিলেন।

য়ুয়াং-চুয়াং চীন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য নালন্দায় আসেন। সে সময়ে শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ। য়ুয়াং-চুয়াং শীলভদ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "নানা দেশে, নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে সকল সন্দেহ মিটে নাই, গুরু শীলভদ্র এক কথায় সে সকল সংশয় দূর করিয়াছেন"। এই য়ুয়াং-চুয়াং এরই শিষ্য প্রশিষ্য একদিন জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সূত্রে, বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, মাঞ্চুরীয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পিকিনে একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে, উহার ৫টী চূড়া বাঙ্গালার পঞ্চরত্ন মন্দিরের মত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত পাঁচটি স্বর্ণময় বুদ্ধ মূর্ত্তি ও স্বর্ণ সিংহাসন লইয়া চীনে আশ্রয় ল'ন। সেখানে তিনি তিব্বতীয় ও ভারতীয় শিল্পীদের সাহায্যে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহাতে এখনও বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের মত অক্ষরে মন্ত্র খোদিত আছে।

"চীন এক বিরাট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন বা অনুভূতি বিষয়ে, এক লাউ-ৎসে-র উপনিষৎ গ্রন্থ ছাড়া তাহার আর কিছুই ছিল না। কন্‌ফুশিউস্ এর শুষ্ক পৌরদর্শন, চীনের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। সেই হেতু চীনের সভ্যতা অসম্পূর্ণ ছিল। ভারতের বৌদ্ধ দর্শন, বুদ্ধদেবের করুণা ও মৈত্রীর বাণী, ভারতের ত্যাগের ও আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ, ভারতের অন্তর্দৃষ্টি, চীন ভারতের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। **বাঙ্গালা ও মগধ হইতে শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া সেখানকার দশ ভাগের নয় ভাগ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।**"

তিব্বতে বাঙ্গালী—তিব্বত হইতে পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালায় আমন্ত্রণ আসিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার প্রধান আচার্য্য বাঙ্গালী শান্ত রক্ষিত তিব্বতরাজ থ্রিসরঙ দিউস্থান কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গমন করেন। তিনি তিব্বতীয় বনধর্ম্মকে খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থাপন করেন। তিব্বতের লামা-সম্প্রদায় ইহারই প্রবর্ত্তিত। তিব্বতরাজ ইহাকে "বোধিসত্ত্ব" উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার পর নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদ্দণ্ডপুর, জগদ্দল প্রভৃতি মহাবিহার হইতে বহু বাঙ্গালী তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। আচার্য্য কমলশীল তিব্বতে চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধমতের প্রাধান্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শান্ত রক্ষিত, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর, জিনমিত্র, বিরোচন, মঞ্জু ঘোষ প্রভৃতি বহু বৌদ্ধপণ্ডিত তৎকালীন তিব্বতরাজ রল্পচান কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গিয়াছিলেন। **বাঙ্গালী দীপঙ্কর** যাঁহাকে উদ্দণ্ডপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীলভদ্র "শ্রীজ্ঞান" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিব্বতরাজ আমন্ত্রিত করিতে স্বীয় ভ্রাতা বীর্য্যচন্দ্রকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিব্বত গমন করেন। একশত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত অশ্বারোহী পুরুষ বাদ্যযন্ত্র, নিশান ও শ্বেত ছত্র লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল। তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে "অতীশ" (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি তিব্বতের ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্য শেষ করিয়া ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে নেয়ঙ নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। অতীশ বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিত অভয়কর গুপ্তের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম। "অমর বাঙ্গালী" অধ্যায়ে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যবদ্বীপে বাঙ্গালী—বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সে দেশের শ্রাবক সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Indian Shipping নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "**জাভার বরবুদর**

মন্দিরের স্থাপত্য কৌশলে বাঙ্গালী স্থপতির হাত দেখা যায়। তাহারা কলিঙ্গ ও গুজরাটদেশীয় স্থপতিগণের সহিত একযোগে এই বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দির গাত্রে যে সকল জলযানের চিত্র দেখা যায়, এই প্রকারের জলযানই দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, চীন ও জাপানে ধর্ম্ম প্রচার, ব্যবসা ও উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইবার জন্য নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিত।" মালয়ে প্রাপ্ত খৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর একটি অনুশাসনে দেখা যায় মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত (বাঙ্গালী) একখণ্ড ভূমি দান করিতেছেন। **যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণের গুরু ছিলেন গৌড়ীয় কুমার ঘোষ।**

যবদ্বীপের মন্দিরাদির শিল্পসৌষ্ঠব ও দেবদেবীর মূর্ত্তি সে দেশে বাঙ্গালী প্রভাবের পরিচয় দেয়। যবদ্বীপে "বরবুদর" মন্দিরের সহিত পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত পাহাড়পুরের (প্রাচীন সোমপুর) ধর্ম্মায়তনের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যবদ্বীপের সিংহেশ্বরীর ভগ্নস্তূপ মধ্যে একখানি মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এ মূর্ত্তি-কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব।

অন্যান্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালী—খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। সেকালে বঙ্গ হইতে চীনে, যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে যাইবার সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং তাম্রলিপ্তি হইতে জাহাজে চড়িয়া চীনে গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তি গৌড়-বঙ্গ-মগধের বহির্ব্বাণিজ্যের বন্দর ছিল। ইবন্‌বাতুতা লিখিয়াছেন তিনি সুবর্ণগ্রাম হইতে যবদ্বীপ ও তথা হইতে চীনে গিয়াছিলেন।

বোম্বে গেজেটীয়ারে দেখা যায় "সুমাত্রার সমস্ত হিন্দু অধিবাসীই ভারতীয় উপকূল হইতে আগত, এবং যবদ্বীপ ও কাম্বোজ—বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মস্‌লিপটম হইতে আগত বিদেশীর দ্বারা উপনিবিষ্ট।" সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, সুম্ব্যওয়া, ফোরেস্‌, তিমোর প্রভৃতি দ্বীপগুলিকে আজকাল Indonesia বলে। প্রাচীনকালে সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ হিন্দুসভ্যতার

কেন্দ্র ছিল। এ সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা একদিন হিন্দু ছিল। বর্ত্তমানে যবদ্বীপের দশ লক্ষ হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য অধিবাসী মুসলমান ধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখনও তাহাদের হিন্দুপূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তির কথা লইয়া গর্ব্ব করে, সারারাত্রি রামায়ণ মহাভারতের নাটক অভিনয় ও পুতুল নাচ করে। ফরাসী ইণ্ডোচীনের মধ্যে কোচিনচীন (চম্পা) ও কাম্বোজ বৃহত্তর ভারতের দুইটি বিশিষ্ট অংশ। ইহা ছাড়া শ্যামদেশের লোকেরা এখনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রাজার নাম "প্রজাধিপক সপ্তম রাম।" রাজ্যের রাজধানীর নাম "অযোধ্যা।" এ দেশেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের খুব প্রচলন।

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী চীন ও জাপানে যাইয়া ধর্ম্ম, স্থপতি, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করিতেন, তাহা জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহা পাল ও সেন রাজগণের সময়কার বঙ্গাক্ষর। আমাদের দেশে এক হাজার বা বারশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের দস্তুর মত আড়ত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ—উদাসীন। এশিয়ার নানাস্থান হইতে যদি আমরা পুরাতত্ত্ব সন্ধান করি, তবে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের অনেক কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী—ব্রহ্মদেশেও প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন পুরানোক্ত "হংসাবতী" রাজ্যের মধ্যে রেঙ্গুণ নগরী প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ব্রহ্মের নাম ছিল "স্বুবর্ণভূমি"—উৎকল মণ্ডল বা উড্র। বর্ত্তমান বেসিনের নাম ছিল "কুসুমপুর"। প্রাচীন প্রোমের নাম ছিল "শ্রীক্ষেত্র"। এই সকল নাম হইতে বোঝা যায় আজ-কাল ব্রহ্মদেশ আমাদের যত পরিচিত ও আপন, প্রাচীনকালে তাহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ট ছিল। ইহা সুনিশ্চিত, দক্ষিণভারত হইতে জলপথে ও উত্তরভারত হইতে স্থলপথে

ভারতীয় ও বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় রাজারা মণিপুর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ওদেশে উপনিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহাদেরই বংশধরেরা বর্ম্মী সমাজের **"পোন্না"** বা **পোণা-ব্রাহ্মণ**। "প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে মধ্য ও দক্ষিণ ব্রহ্মের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের লইয়া গঠিত হইয়াছিল।" "পাগানের আনন্দ বৌদ্ধ মন্দিরকে কেহ কেহ বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমির পাহাড়পুর স্তূপের নকলে প্রস্তুত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মের ভাস্কর্য্যে ও মৃত্তিকায় খোদিত চিত্রে বাঙ্গালার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট ; বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল ঔপনিবেশিক প্রাচীন ও মধ্য যুগে ব্রহ্মে আসিত, তৎ সম্বন্ধে প্রাচীন ব্রহ্মের লেখে 'গোল' অর্থাৎ গৌড় বা বাঙ্গালা দেশের লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়।" ইংরাজ যুগে ব্রহ্মদেশে বহু বাঙ্গালী চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষে গমন করিয়া স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আজ বর্ম্মীরা বাঙ্গালীদিগকে "র্কলা বা সাগর পারের বিদেশী" মাত্র বলিয়া অসূয়া প্রদর্শন করে। ব্রহ্ম বিচ্ছেদের সঙ্গে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রহ্ম প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে।

নেপালে বাঙ্গালী—বাঙ্গালীরা নেপালের সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কার, চিত্র ও স্থাপত্যকে নব রূপ দিয়াছে। **মুসলমান বিজয়ের সময় নেপাল বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগকে এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ রক্ষা করিয়া বাঙ্গালাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে।**

বাঙ্গালার বাহিরে প্রাচীন বাঙ্গালী উপনিবেশ—ইহাই হইল, ভারতের বাহিরে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস। সুদূর অতীতকাল হইতে বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের বাঙ্গালার বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের অনেক স্থলে এখন স্বাতন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর বঙ্গে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহাদেরই বংশাবলী আজ

দিল্লীর **গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ** বলিয়া পরিচিত। দিল্লী, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে "গৌড়তগা" ব্রাহ্মণ পরিচয়ে অনেকে বাস করেন তাঁহারাও গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা রাজার দান প্রতিগ্রাহী হইয়া গৌড়ের ব্রাহ্মণাচার হইতে পতিত হইয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করায় 'গৌড়তগা' নাম প্রাপ্ত হ'ন। কুরুক্ষেত্রবাসী আদি-গৌড়গণও আপনাদিগকে জনমেজয় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত বলিয়া থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গের আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সংস্রবে সর্প-বশীকরণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাঙ্গালীরা এইজন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাদুমন্ত্র-বিশেষজ্ঞ বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে বাঙ্গালীগণ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

খৃঃ দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে উচ্চপদাধিষ্ঠিত এক বাঙ্গালীর সন্ধান পাওয়া যায়। **গদাধর** নামে বরেন্দ্রীর এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত "কার্ত্তিকেয় তপোবন" নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করেন। কোলাগুল্লা তাঁহার রাজধানী ছিল।

আর একটি গৌড় সন্তান ১১৯১ খৃঃ উত্তর ভারতের গাহড়বাল জেলার রাজা হ'ন এবং **পবিত্র কেদার-বদ্রি ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন।** ঐ প্রদেশেই আর একটি বঙ্গীয় বীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১১৯২ খৃঃ চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে বন্দী হইলে তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি **গৌড়দেশীয় উদয়রাজ** তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মাসাধিক কাল ধরিয়া দিল্লী অবরোধ করিয়া ক্রমাগত সহরের উপর আক্রমণ চালান। ঘোরী আতঙ্কিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেন। প্রভুভক্ত বীর হতোদ্যম হইয়া অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। আর একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী "দর্ভাভিসার" নামক স্থানের অধিপতি হ'ন। তাঁহার পৌত্র শক্তিস্বামী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের মন্ত্রী হ'ন। গদাধর, লক্ষ্মীধর, যশপাল, শ্রীধর, গোকুল, ভোজ,

মহীপাল প্রভৃতি গৌড়ীয়গণ খৃঃ ১১৬৭ হইতে ১২৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত চন্দেল রাজবংশের মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাপ্ত অনুশাসনে জানা যায় জনৈক গৌড়ীয় ক্ষত্রিয় রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান উদয়পুর রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যস্থাপন করেন।

সিমলা শৈল ও কাশ্মীর মধ্যবর্ত্তী হিমালয় অন্তর্গত সুকেত, কৃষ্ণবর, মণ্ডী, কেঁওথল প্রভৃতির রাজারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন বাঙ্গালী জয়দেবের মধুর পদাবলী সারা ভারতকে পাগল করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের চরিত-লেখক চাঁদবর্দ্দাই "পৃথ্বীরাজ রায়সাতে" জয়দেবের নাম পরম ভক্তিভরে উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পুরাণপুরী পদব্রজে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া কাস্পীয়হ্রদের উপকূলে বহু হিন্দু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতের বাহিরে উপনিবেশ রহিত—কিন্তু বঙ্গে পাঠান রাজ্যগঠিত হইলে বাঙ্গালী হিন্দু আত্মরক্ষার্থ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। পরাধীন দেশের ভয় হইল যে বিদেশে বণিকরা যে শুধু মান পাইবে না তাহা নহে, বিদেশী আচার বিচার আমদানী করিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিবে এবং বিদেশী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাওয়াইবে। ফলে একদিকে অহিন্দু-সংস্পর্শ ও অন্যদিকে **সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়।** আরবীয় বোম্বেটের অত্যাচার ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য লোপেরও একটি প্রধান কারণ। তাম্রলিপ্তি প্রভৃতির পতন বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা নিষেধের পরিণতি। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় হওয়ায় বহির্ব্বাণিজ্য লোপ পায়। ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিহাস এ যুগ হইতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে সীমাবদ্ধ হয়।

ভারতে বাঙ্গালী ঃ প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগ—তুর্কী আক্রমণের পর হইতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন। কুলপঞ্জিকাগুলি ভ্রমপূর্ণ ও

অতিরঞ্জিত। যাহা হউক, খৃঃ ১২০০ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ (পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরাজের অভ্যুদয়ের তারিখ) মধ্যে বাঙ্গালীর অন্যান্য প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস কম শ্লাঘার বিষয় নহে। এই যুগের ভিতর বাঙ্গালী উৎকল, কাশী, বৃন্দাবন, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে উপনিবিষ্ট হয়। জয়দেব ও চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়বাসী বাঙ্গালী কুল্লুকভট্ট কাশীবাসী হ'ন এবং তথায় মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। আদম স্থমারীর রিপোর্টে দেখা যায় রোহিলখণ্ডে "সম্বল" নগরে ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে এবং আমরোহা নগরে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীন বগড়া খাঁ প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে কয়েকঘর গৌড়ীয় কায়স্থ লইয়া গিয়া এলাহাবাদ স্থবায় নিজামাবাদ, ভাদোই কলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। নিজামাবাদ তাঁহাদের প্রবাস বাসের আদিস্থান বলিয়া তাঁহারা "নিজামাবাদী" আখ্যা পান। তাঁহারা সকলেই প্রায় শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গতিবিধির সূত্রপাত হইয়াছিল। মথুরাঞ্চলের বিশেষতঃ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব উপনিবেশ স্থাপনের বহুদিন পরে সনাতন গোস্বামী রাজপুতনায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করেন। অম্বররাজ মানসিংহ কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবীর সহিত বাঙ্গালী পুরোহিতগণকে জয়পুরে লইয়া গিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটগণের শাসনকালে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ও সম্রাট দরবারে বিশিষ্ট বাঙ্গালী সন্তানগণের গমনাগমন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ভার্টোম্যানাস্ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্ম লিখিয়াছেন, "অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল।"

বারাণসীতে বাঙ্গালী—মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় কাশী গৌড়-মগধের অধীন হয়। তাঁহার পৌত্র প্রিয়দর্শীর সময় কাশীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সময় কাশীতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের সৃষ্টি হয়। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাটদিগের অধীনে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে কাশী কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার অধীন হয় এই সময় কাশীতে দেবচর্চ্চার বাহুল্য দেখা যায়। অনেক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং কাশীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কাশীখণ্ড প্রণীত হয়। দেবমুর্ত্তি গঠননিমিত্ত প্রসিদ্ধ শিল্পিরাও গৌড় হইতে এসময় কাশীতে আগমন করে। গৌড়ে এসময় আদিশূরের অভ্যুদয়। সে সময় যেমন বাহির হইতে ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনীত হইয়াছিল তেমনি গৌড় হইতেও বহু ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতে আসিয়াছিলেন। এইজন্যই কাশীতে আজও গৌড় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য। "দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিগ্রহচুর্ণকারী মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট সেকেন্দর লোদীর সেনাপতি বার্ব্বাকশাহ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি কাশীর বিগ্রহাদি বিচূর্ণিত হয় এবং বঙ্গদেশ ও রাজপুতনা প্রভৃতি হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ মন্দির ও বিগ্রহাদি পুনর্গঠন করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়।" নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণমূর্ত্তি গঠনে বিশেষ পটু থাকায় কাশীতে তাহাদের খুব আদর ছিল। হালিসহর নিবাসী নয়ন ভাস্করের নাম কাশীখণ্ডে পাওয়া যায়। খৃঃ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কাশী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। পরে সেন রাজারাও কাশী অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়দেব ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুল্লুকভট্ট, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি কাশী প্রবাসী হ'ন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কাশীধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসীদিগের আবির্ভাব হয়। নবদ্বীপে মুসলমান অত্যাচার অসহনীয় হইলে অনেকেই কাশী আসিয়া বাস

করেন। চৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উৎকল, রাজপুতনা, ব্রজমণ্ডল, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। শ্রীরূপ, সনাতন, জীব, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে কাশীপ্রবাস করিয়া যান। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বনামধন্য কাশীরামদাস মহাভারত রচনা সমাপ্ত করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালীরা ধর্ম্মার্থে কাশীবাস করিতে ও পুণ্য-ক্ষেত্র কাশীতে দেহরক্ষা করিতে যাইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আওরঙ্গজেব কাশীর হিন্দুমন্দির সকল ধ্বংস করেন এবং বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন এবং কাশীর নাম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে উহার নাম 'মহম্মদাবাদ' রাখেন। আও-রঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়, সেই সময় হিন্দু রাজারা পুনরায় কাশী পুনর্গঠন করেন। ১৭৩০ খৃঃ মহম্মদশাহ হিন্দুর এই প্রধান তীর্থ হিন্দু জমিদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি দিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দেন। ইঁহারই বংশধর চেৎ সিংএর সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ হয়। বর্ত্তমান কাশীর অসংখ্য বিগ্রহ বাঙ্গালী ভাস্করের গঠিত, এবং পথঘাট, কূপ, মন্দির, প্রাসাদ, অন্নসত্র, অতিথিশালা প্রভৃতি বাঙ্গালী জমিদার-গণের অর্থে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণই কাশীর লুপ্ত-তীর্থ সকল উদ্ধার করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে লোকনাথ গোস্বামী, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তৎপুত্র উমাশঙ্কর তর্কলঙ্কারই প্রধান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালী প্রধানগণের কাশী যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। নদীয়ার **রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের** কাশীতে অনেক কীর্ত্তি আছে। **রাজা রাজবল্লভ** কাশীপ্রবাসী হইয়া 'মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাট' নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে এই ঘাট নির্ম্মাণের দস্তরি হইতে 'শীতলা দেবীর ঘাট' ও 'দশাশ্বমেধের কাঁচা ঘাট' নির্ম্মিত হয়। তারপর **রাণী ভবানী** কাশীবাসী হন।

তিনি স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নাটোরের জমিদারীর মালিক হন। তাঁহার জমিদারীর মুনাফা ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। কাশীর প্রসিদ্ধ 'দুর্গাবাড়ী' এবং 'দুর্গাকুণ্ড' রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত। তিনি 'আদি-কেশবের ঘাট' নির্ম্মাণ করেন ও বহু ছত্র স্থাপন, পুষ্করিণী খনন ও দেবালয় ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬০ জন ব্রাহ্মণকে এক একখানি করিয়া বাড়ী ও প্রত্যেককে এক এক হাজার করিয়া টাকা দান করেন। কাশীর 'বাঙ্গালীটোলা' ও ত্রিপুরা-ভৈরবের 'ব্রহ্মপুরী মহল্লা' তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি বৎসরে ২ লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন এবং সমপরিমাণ টাকা টোলের ছাত্রগণের আহার যোগাইবার জন্য দান করিতেন।

সেকালে হটী বিদ্যালঙ্কার নামক একজন বিদুষী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা কাশীতে টোল খুলিয়া ন্যায়-শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষগনের ন্যায় বিদায় লইতেন। **ত্রিপুরার রাজা, ভুকৈলাসের রাজা, বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয়** প্রভৃতি খ্যাতনামা জমিদারগণ বহু কীর্ত্তি কাশীতে রাখিয়া গিয়াছেন। **কাশিমবাজার রাজবংশের** আদিপুরুষ ও হেষ্টিংসের প্রাণরক্ষক কান্তবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় কাশীনরেশ চৈৎ সিংএর অবরোধবাসীনী রাণীদিগের মানইজ্জৎ রক্ষা পাইয়াছিল। "হরি ঘোষের গোয়াল" প্রবাদ বাক্যের লক্ষ্যস্থল বহু পরিবার পোষণকারী শ্রীহরি ঘোষ এই সময় কাশীবাসী হ'ন। ইনি মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ান ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে **পুঁটীয়ার রাণী** গঙ্গার তলদেশ হইতে প্রস্তরময় সোপান দ্বারা 'দশাশ্বমেধ ঘাট' বাঁধাইয়া তদুপরি 'ব্রহ্মপুরী মন্দির' ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 'প্রাগ্ঘাট'ও তাঁহার কীর্ত্তি। রাজা রামমোহন রায় এই সময় সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ-বেদান্তাদি অধ্যয়ন জন্য কাশীবাসী হন। ১৭৯৯ খৃঃ বাঙ্গালীর অর্থে **জয়নারায়ণ কলেজ** স্থাপিত হইবার পর কাশীতে বহু বাঙ্গালী ছাত্র ও অধ্যাপকের আবির্ভাব হয়। বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের ও তাঁহাদের স্থাপিত চতুষ্পাঠী সকলের নাম উল্লেখ করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে বারাণসী-

ধামে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি **'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'**। কাশী ব্যতীত গাজীপুর, মির্জ্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে বিত্তায় সম্ভ্রমে বাঙ্গালী বহুকাল যাবৎ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। শিক্ষা ও সেবা বাঙ্গালীর আদর্শ,—যতদিন বাঙ্গালী এই আদর্শ হইতে স্খলিত না হইবে বাঙ্গালী ততদিন জগতে শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

প্রয়াগে বাঙ্গালী—"প্রয়াগ পৌরাণিক বারণাবত"। গঙ্গা ও যমুনা যথায় লুপ্ত সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম ত্রিবেণী সঙ্গম। ইহাই যুক্তবেণী। যমুনার কাল জল গঙ্গার সাদা জলে মিশিবার দৃশ্য বড় মনোরম। এখানে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ ও প্রতি বার বৎসর অন্তর পূর্ণকুম্ভমেলা হয়। ইহা বৌদ্ধগণেরও পবিত্র তীর্থ ছিল। এখানে হর্ষবর্দ্ধন মহাদান করেন। সম্রাট আকবর ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যদর্শনে এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম ইলাহাবাস (পরমেশ্বরের আবাস) রাখেন। এই দুর্গের মধ্যেই হিন্দুর অক্ষয়বট, ও বৌদ্ধের অশোকস্তূপ ও অনুশাসনস্তম্ভ। ইলাহাবাস হইতে প্রয়াগের নাম ইলাহাবাদ বা এলাহাবাদে পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় প্রভাবেরও অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। ইংরাজগণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইয়া এলাহাবাদ দুর্গ দখল করেন। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীর আগমন হয়। তখন এলাহাবাদের নাম ছিল "ফকিরাবাদ"। সেকালে ইংরাজাধীনে রাজকার্য্যের সকল বিভাগেই বাঙ্গালীর একাধিপত্য দেখিয়া এতদঞ্চলবাসীরা বাঙ্গালীকে সম্ভ্রম, ভয় এবং ঈর্ষারও চক্ষে দেখিত। হিন্দুস্থানীতে একটি প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, **"লড়ে টোপীওয়ালা খায় ধোতীওয়ালা"**। কিন্তু ক্রমশঃ এমন সব বাঙ্গালীর এখানে আবির্ভাব হইতে লাগিল যে "ঈর্ষা ভক্তিতে ও ভয় প্রীতিতে পরিণত হইল এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল"। *

---

* মাধবদাস বাবাজী ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর ন্যায় দৈবশক্তিসম্পন্ন, প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় পুরুষ-সিংহ, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দেওয়ান জগমোহন বিশ্বাস প্রমুখ পরার্থপরায়ণ বাঙ্গালী এলাহাবাদবাসী হন।

চৈতন্যদেব এইখানেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে দীক্ষা দেন। বর্গী হস্তে নিহত দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পুত্র **জগমোহন** কর্ণওয়ালিশের আমলে স্থানীয় জমিদারগণের সহিত দশসালা বন্দোবস্ত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি কোম্পানীকে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিয়া এলাহাবাদের হিন্দুযাত্রীগণের উপর স্থাপিত কর উঠাইয়া দেন। ৺রামধন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী কন্ট্রাক্টরী করিয়া মৃত্যুকালে ত্রিশলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তিনি যমুনার ধারে **'বাবুঘাট'** নামক একটি ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ঐ ঘাটে বসিয়াই কবি গোবিন্দচন্দ্র "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও" সঙ্গীত রচনা করেন। বারাণসীর বিখ্যাত ৺রামেশ্বর চৌধুরী কন্ট্রাক্টরী করিয়া ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যান। থর্ণহিল ও মেইন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রভৃতি তাঁহার বদান্যতার পরিচয়। কীডগঞ্জ ও দারাগঞ্জে বাঙ্গালী প্রথম বাসস্থাপন করেন। হুগলী দেবানন্দপুরের ৺ঈশানচন্দ্র দাস সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে ই, আই, আর রেলের প্রধান হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসেন। এলাহাবাদ ষ্টেশনের রেল কর্ম্মচারীদিগকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন নবাগত বাঙ্গালীর থাকিবার স্থানাভাব জানিলে তাঁহার বাটীতে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অনেক নিরাশ্রয় বাঙ্গালীযুবক যাঁহারা পরে এতদ্দেশে খ্যাতিল্যাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রথম ঈশান বাবুর বাটী আশ্রয় পান। তাঁহার সৎসাহস, পরোপকারিতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং বদান্যতাগুণে হিন্দুস্থানীরা বলিত **"বাবু তো ঈশান বাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নহি হোয়েগা"**। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "এলাহাবাদের বাঙ্গালীরা নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। * * * নগরের দুর্বৃত্ত লোক এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল * * বাঙ্গালীরা অতঃপর একজন সমৃদ্ধিশালী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল

সংগঠিত করিলেন"। উত্তরপাড়ার ৺প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় রীতিমত যুদ্ধ করিরা বিদ্রোহী সর্দ্দারগণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া **"যোদ্ধা মুন্সেফ"** আখ্যা লাভ করেন। ইহারই উদ্যমে ও ৺সারদাপ্রসাদ সান্ন্যালের চেষ্টায় বিখ্যাত মেওর সেণ্ট্রাল কলেজ স্থাপনার সূত্রপাত হয়। স্থানীয় প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্রও ইহাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। **সারদাবাবুর চেষ্টাই হিন্দি ভাবিকালে আদালতের ভাষা বলিরা গণ্য হয়** এবং বিপক্ষপক্ষের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়। লাট সাহেব যখন সারদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেখিতেছি আপনারা বাঙ্গালী, এদেশে চাকুরী উপলক্ষে আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে হিন্দি প্রবর্ত্তিত হইলে আপনাদের লাভ কি?" উত্তরে সারদাবাবুর সহকর্ম্মী রামকালীবাবু উত্তর দেন "মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য, যে দেশে বাস করা যায় দেশীয় লোকের হিত চিন্তা ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নপর হওয়া। বাঙ্গালীজাতি এত স্বার্থপর নহে যে এরূপ অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইবে।" প্যারিমোহন বাবু মাননীয় হাইকোর্টের জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাহাবাদে আনেন। পাণিহাটী গ্রামের ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সম্মান পাইয়াছিলেন এবং প্রভুত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি খেরি জেলায় ক্ষয়রোগগ্রস্থ রোগীদিগের জন্য একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করেন। সিমলা ধরমপুর ক্ষয়রোগ চিকিৎসা-আশ্রমেও তিনি বিনা বেতনে রোগীদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বড় বড় রাজা জমিদার তাঁহার উপর একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহাকে গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাল্যের দারিদ্র্যের কথা তিনি ভুলেন নাই। দরিদ্রের তিনি 'মা বাপ' ছিলেন।

এলাহাবাদের "এংলো-বেঙ্গলী স্কুল" ৺শীতলপ্রসাদ গুপ্তের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। "বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীরা The Indian Girls' Free High School স্থাপন করেন। এলাহাবাদ 'অনাথ আশ্রমের' সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। তবে

এলাহাবাদের বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি চিন্তামনি বাবুর "ইণ্ডিয়ান প্রেস"। শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ মেজর বামনদাস বসু 'পাণিনি কার্য্যালয়' স্থাপন করেন। এই শ্রীশ বাবুই বারাণসীর "সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ" প্রতিষ্ঠায় গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। **রামানন্দ বাবু** এলাহাবাদ 'কায়স্থ পাঠশালা' কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। এখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র ও ইংরাজী Modern Review প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় ডাঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যয়েরও এখানেই সাহিত্যচর্চ্চার হাতে খড়ি হয়। বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ নীলরতন ধর প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ বহু বাঙ্গালী অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেছেন।

ব্রজমণ্ডলে বাঙ্গালী—মধুদৈত্যের পুরী 'মধুরা' পরে মথুরা নাম লাভ করে। সুরসেন নামধেয় যাদবগণ ইহাকে রাজধানী করেন। রাজ্যের নাম ব্রজমণ্ডল ও অধিবাসীর নাম ব্রজবাসী হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজধামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়। অশোকের সময় ব্রজমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পায়। বৌদ্ধ প্রচারক-গণের অধিকাংশ বাঙ্গালীই ছিলেন। কালে শৈব, শৌর, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি পরিত্যক্ত, অরণ্যসমাকুল ও অদৃশ্য হয়। মথুরা মধুবনে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে হিন্দুরাজগণের সাহায্যে মথুরার যে উন্নতি আরম্ভ হইল, একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী তাহা বিংশতি দিবসে ধ্বংস করেন। মথুরা আবার মধুবনে পরিণত হয়। ক্রমশঃ আবার হিন্দু রাজাদিগের চেষ্টায় উহার উদ্ধার আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়দেব এখানে আসিয়া কেশীঘাটে কিছুকাল বাস করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মথুরা শান্তি উপভোগ করে। এই যুগে শ্রীহট্ট নিবাসী অদ্বৈতাচার্য্য ব্রজমণ্ডলে আসেন। তিনি যে বট বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা অদ্বৈত বট নামে খ্যাত এবং উহা বৈষ্ণবদের একটি তীর্থে পরিণত

হইয়াছে। নিত্যানন্দও তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে ব্রজমণ্ডলে আসেন। তারপর আসিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন ভগবানের লীলাস্থলসমূহ অদৃশ্য, ব্রজবাসীরাও সন্ধান দিতে পারে না। এই দেখিয়া তিনি আকুল ক্রন্দনে ব্রজের রজঃ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ব্রজবাসী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইল এবং পাণ্ডিত্যের নিকট নতশির হইল। এইখানেই রূপ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব রূপকে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে নিয়োগ করেন। রূপের ভ্রাতা সনাতনকেও কাশী হইতে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে প্রেরণ করেন। এখানেই পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহু আয়াসে "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হইবার পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া শোকে দুঃখে কৃষ্ণদাসের জীবনান্ত হয়। যাহা হউক, পরে রাজার গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার হইয়া সাধারণ্যে প্রচার হয়। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীও বৃন্দাবনবাসী হন। জীবের শিষ্য শ্রীনিবাসও বৃন্দাবন প্রবাসী হন ইঁহারা ছাড়া আরও বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন।

রূপ গোস্বামী গোবিন্দদেবের বিগ্রহ আবিষ্কারের পর মানসিংহের অর্থানুকুল্যে গোবিন্দজীর অপরূপ কারুকার্য্যখচিত বিরাট মন্দির ১৫৯০ খৃঃ নির্ম্মাণ করান। সনাতন লোহিত প্রস্তর দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই মন্দিরের শীর্ষদেশে প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে ও পরে নাগ্‌রী অক্ষরে একটি সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। ইহা ছাড়া অনেক বিগ্রহ ও মন্দির আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। **লোকনাথ গোস্বামী ৬৬৩টি বনের উদ্ধার করেন।** এই সময় ১১শ শতাব্দীর ব্রজধামের গৌরবশ্রী আবার ফিরিয়া আসে। সম্রাট আকবর স্বয়ং বৃন্দাবন দর্শনে আসিয়া স্থান মাহাত্ম্যে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যে বৈষ্ণবগণকে ও হিন্দুরাজগণকে মন্দির নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সুখ বেশীদিন সহিল না। আকবর ও সাজাহান পরলোকগত হইলে আওরঙ্গজেব ময়ূর-সিংহাসনে আসীন হইয়া একদা গোবিন্দজীর মন্দিরের আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। তখনই উহা ভগ্ন করিয়া উহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিল। এই অসদভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইয়া দরবারস্থ হিন্দুগণ গোস্বামিগণকে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন রাজপুতনার রাজগণের সাহায্যে বৃন্দাবন, গোকুল, মথুরা প্রভৃতি হইতে বিগ্রহগুলি রাজপুতনার নানাস্থানে স্থানান্তরিত হইল। ইহার অনতিবিলম্বেই আসিল মোগলসেনা। ১৬৬৯ খৃঃ আওরঙ্গজেবের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনধাম ধ্বংস হইল। গোবিন্দজীর মন্দির মসজিদে পরিণত হইল, আওরঙ্গজেব তাহাতে নমাজ পড়িয়া গেলেন। পূজারি ও গোস্বামিগণ স্ব স্ব দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করিলেন। বাঙ্গালী গোস্বামীগণের অধিকাংশই জয়পুরে আশ্রয় লইলেন। পুনরায় ১৭৪৮ খৃঃ আহম্মদ শাহ আবদালী মথুরা ধ্বংস করিয়া হিন্দু অধিবাসীদিগকে নরনারী নির্ব্বিশেষে হত্যা করেন। ১৮০৩ খৃঃ মথুরা বৃটীশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ বৎসরেই ৩১শে আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে "এমন ভূমিকম্প হয় যে অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র মথুরার মুসলমানদিগের গৃহতোরণ মসজিদ প্রভৃতি ধূলিসাৎ হইয়া যায়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাইকপাড়া রাজবংশের কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে **লালাবাবু** ৩০ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া এখানে আসেন। তিনি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মর্ম্মর প্রস্তরে 'কৃষ্ণচন্দ্রমার' মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি 'রাধাকুণ্ড' বাঁধাইয়া দেন এবং অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এক লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী দান করেন। তিনি ভক্তমালগ্রন্থের অনুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হ'ন। কিন্তু বাবাজী তাঁহাকে বলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার এখনও সময় হয় নাই।" তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনান্তে মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। এত ত্যাগেও কেন যে গুরু দীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক বুঝিতে না

পারিয়া সর্ব্বদাই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার পূর্ব্বশত্রু মহাধনী শেঠবাবুদের ঠাকুরবাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে মনে পড়িল, আমি সব ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু এখনও মনের কোণ হইতে শেঠজীদের প্রতি অসূয়া মুছিয়া ফেলি নাই। আমি ত সকলের কুঞ্জে ভিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু শেঠদের ঠাকুরবাড়ী এড়াইয়া চলিয়াছি"। তখনই বুঝিলেন গুরু ঠিকই বলিয়াছেন সময় হয় নাই। আর দ্বিধা না করিয়া শেঠদিগের ঠাকুরবাড়ী প্রবেশ করিয়া মান অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নিয়া "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শেঠদের কর্ম্মচারীরা হতভম্ব হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, শেঠজী ছুটিয়া আসিয়া প্রেমাশ্রু নেত্রে ভিখারীর পদ ধারণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিবার অনুমতি চাহিলেন।

লালাবাবু শেঠজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি মুষ্টির ভিখারী।" লালাবাবুর মুষ্টিভিক্ষা লইয়া ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখেন সম্মুখে গুরু কৃষ্ণদাস। লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাবাজী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত, আর বিলম্ব করিও না।" লালাবাবুর পর ২৪ পরগণা বহড়ু গ্রামের জমিদারবংশের আদিপুরুষ **নন্দকুমার বসুর** আগমন হয়। তাঁহার কুঞ্জবাটী "বোসেদের কুঞ্জ" বলিয়া খ্যাত। তিনি মদনমোহনের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন ও গোবিন্দজী ও গোপীনাথের মন্দির সংস্কারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। তাহার পর আসেন শোভাবাজারের রাজা **রাধাকান্ত দেব** বাহাদুর। তাঁহার সজ্ঞানে মৃত্যু অতীব আশ্চর্য্যপ্রদ ঘটনা। তাঁহার পর আরও অনেক সুধী বাঙ্গালী এখানে আসেন।

আগ্রায় বাঙ্গালী—আগ্রার প্রাচীন নাম "অগ্রবন"। অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৃন্দাবনের পথে এখানে তীর্থ করিতে আসিতেন। আকবর শাহ যোধপুরপতির নিকট হইতে ইহা জয় করিয়া ল'ন। তিনিই ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে ইহাকে বিরাট নগরীতে রূপান্তরিত করেন। তাঁহার পৌত্র সাজাহান প্রিয়তম

মহিষীর সমাধির উপর ৬ কোটী টাকা ব্যয়ে ১৭ বৎসরে "মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য" তাজমহল নির্ম্মাণ করেন। প্রতাপাদিত্য রাজনীতি শিক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের পর এখানে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। **মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী** প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী ও আগ্রা বাঙ্গালা লাইব্রেরী এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। আগ্রায় ডাঃ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চিকিৎসাবিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা ও সুনাম অর্জ্জন করেন যে, রাজপুতনার তাবৎ রাজন্যবৃন্দ তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে উৎসুক হইতেন। তিনি বাঙ্গালীর নিকট কখন পারিশ্রমিক লইতেন না। ডাঃ দয়ালচন্দ্র সোমেরও প্রতিপত্তি কম হয় নাই। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, নেপাল, বাঁকিপুর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তাহার পর আগ্রায় আসেন ডাঃ গিরিশচন্দ্র মিত্র। সে সময় আগ্রা কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই ছিলেন বাঙ্গালী। আঁছুলের যমুনাদাস বিশ্বাস মহাশয় আগ্রায় একজন সর্ব্বজনমান্য ও সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "আগ্রা নসীম" নামে একখানি উর্দ্দু সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন। **"যমুনালহরীর" কবি গোবিন্দচন্দ্র** এখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে এককালে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জীবনের কতক সময় এখানে কাটান। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবিনাশবাবুর মত আর কোন বাঙ্গালীই বোধ হয় সর্ব্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার ছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বসু। এই প্রদেশস্থ ফতেগড়, রোহিলখণ্ড, ঝান্সী, কানপুর, মৈনপুরী জেলা প্রভৃতিতে অনেক বাঙ্গালী প্রবাস স্থাপন করিয়া এখনও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বুন্দেলখণ্ডেও প্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব নাই। সিপাহীযুদ্ধের সময় বাঙ্গালীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী ও ডাক্তারী প্রভৃতি কর্ম্ম উপলক্ষে এতদ্দেশে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। প্রায় অধিকাংশ স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালী, বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার, ঔষধালয়,

রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। আলীগড়ে বিখ্যাত গণিতাচার্য্য যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রবাসী হন। এখানে ডাঃ ত্রৈলক্যনাথ বসু চিকিৎসা ব্যবসায়ে পারদর্শিতার জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বিদেশ প্রবাসের একটি বিশেষত্ব এই যে, **যেখানে তাঁহারা গিয়াছেন সেইখানেই কালীবাড়ী, স্কুল, হরিসভা, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা, সংবাদপত্র, হিতসাধিনী সভা, ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন।**

অযোধ্যায় বাঙ্গালী—লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। ইহার প্রাচীন নাম লক্ষ্মণাবতী। এখানে লক্ষ্মণ নামে জনৈক হিন্দু আহীর "কিল্লা লক্ষ্মণ" নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই দুর্গই এখন "মচ্ছিভবন" নামে খ্যাত। লক্ষ্ণৌর নবাবগণ পূর্ব্বে ৫৪৫৲ টাকায় পঞ্চমহল্লা ও মচ্ছিভবন দুর্গের ভাড়াটিয়া ছিলেন। নবাব আসফ-উদ্দৌলা এই নবাব বংশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে **"যিস্‌কো না দেয় মৌলা উস্‌কো দেয় আসফউদ্দৌলা,"** অর্থাৎ ভগবানও যাহাকে বঞ্চিত করেন আসফ-উদ্দৌলা তাহাকে দান করেন। তাঁহার শাসনকালে উত্তরপাড়ার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার তোষাখানার দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রশেখর মিত্র তাঁহার মীর মুন্সীর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগারাদিতে কার্য্য করিবার জন্য বহু বাঙ্গালী যন্ত্র-শিল্পী লক্ষ্ণৌতে প্রবাসী হন। **এখানকার প্রাচীন মানমন্দির বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি।** সিপাহী যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীরা বাঙ্গালীকে ইংরাজের পরামর্শদাতা মনে করিয়া ঘোষণা করে, "যে ব্যক্তি একজন বাঙ্গালীর মস্তক আনিতে পারিবে তাহাকে ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে"।

এই সময় প্রবাসী বাঙ্গালীদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, ওদেশীয় ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা বাঙ্গালীদিগকে নিরপরাধ জানিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ বাঁচাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌর তদানীন্তন কোষাধ্যক্ষ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লাঞ্ছনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় তালুকদারী লাভ করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় পূর্ব্বতন তালুকদারগণ বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হইয়াছেন। আর একজন বাঙ্গালী, টাকীর আনন্দলাল্ চৌধুরী, অযোধ্যার শিক্ষাজগতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভীঙ্গার রাজা, মামুদাবাদের তালুকদার, রাজা রামপাল প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও এখানে সর্ব্বজনবরেণ্য হন। তিনি সুবিখ্যাত "লক্ষ্ণৌ টাইমস্" পত্রিকার প্রথম প্রকাশক। সেই বংশের ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাঙ্গালীর গৌরব। তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভিকতা ও দৃঢ়তা অনুকরণযোগ্য। কপিলবস্তু ও পাটলিপুত্রের আবিষ্কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ সালে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন। ডাঃ রামলাল চক্রবর্ত্তী এখানে পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা লোকপ্রিয় হন। রাজা, মহারাজা এবং সমস্ত তালুকদারই তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। অনেকেই তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহাকে পেন্সন দিতেন এবং কেহ কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্যও মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে মৃত দেহ স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কানপুরের গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে সৎকার করা হয়। ২৪ পরগণা পানীহাটী নিবাসী ৺অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল ও আউধ টাইমস্" নামে ইংরাজী ভাষায় দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন।

বর্ত্তমানের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকে বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া থাকে। কারণ ইহার প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হন জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, ও প্রায় প্রত্যেক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকগণও বাঙ্গালী এবং বহু ছাত্রও বাঙ্গালী। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ রাধাকমল, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ভূজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির যশ সমগ্র প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌর বাহিরে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশেও বাঙ্গালী অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এমন জেলা নাই যেখানে প্রতিপত্তিশালী বাঙ্গালী উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি ছিল না।

পঞ্জাবে বাঙ্গালী—পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ প্রাচীনকালে "কেকয়রাজ্য" নামে পরিচিত ছিল। আর্য্যরা প্রথম এই প্রদেশেই আসেন। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এই প্রদেশেই অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র আম্বালার ৩০ মাইল দক্ষিণে। এই কুরুক্ষেত্র লইয়াই মহাভারত। আর মহাগ্রন্থ মহাভারতই ভারতমধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা-দেশেই বিশেষভাবে আদৃত। কুরুরাজগণের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতাই ইহার কারণ। এই কুরুক্ষেত্র অন্যান্যভারতীয় রাজার সহিত বঙ্গাধিপের দেহও ভস্মীভূত হয়। সর্পবশীকরণকুশল অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে আহুত হইয়া দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বসবাস স্থাপন করিয়া "গৌড়তগা" নামে পরিচিত হন। দিল্লীতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল—এই পঞ্চগৌড় হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাসস্থাপন করেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে "আদিগৌড়" নামে পরিচয় দেন। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীগণ এদেশে আসেন। বাঙ্গালার পালরাজগণ পঞ্জাব জয় করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত সিমলা শৈলের উত্তরে অবস্থিত মণ্ডি, কুলু, কাংড়া প্রভৃতি রাজ্য বাঙ্গালী সেনরাজবংশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। দ্বাদশ শতাব্দীতেও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

বাঙ্গালী কায়স্থ **ঈশানেশ্বর সর্ব্বাধিকারী** দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ সাহের (১৪০৯) উজীর ছিলেন। তাঁহার বংশীয় ভুবনমোহন সম্রাট্ শাহ আলমের মন্ত্রীপদ লাভ করেন। আকবর শাহের সময় পণ্ডিত পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ **রাজা পীতাম্বর মিত্র** দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন।

১৮৪০ খৃঃ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীতে কালীবাড়ী স্থাপন করেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীরা উহা দগ্ধ করে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যাওয়ায় এখন বহু বাঙ্গালী দিল্লীতে প্রবাসী হইয়াছেন। রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন।

দিল্লীর পর লাহোরই পঞ্জাবে বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দপ্তরখানার চাকুরীতে এখানে বহু বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। **কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী** এখানেও কালীবাড়ী স্থাপন করেন। কৃষ্ণানন্দের কীর্ত্তিস্থল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। তিনি হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতের শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিভ্রমণ ও তপঃসাধনা করেন। আরাবল্লী পর্ব্বতশিখরে ও বারাণসীধামে তাঁহার আশ্রম ছিল। **দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সমগ্র উত্তরভারতে তিনি ৩২টি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন**। ইঁহারই জন্য বাঙ্গালীর প্রবাসবাস সুগম হয়।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় ও ওখানকার কলেজ ও স্কুলগুলি বাঙ্গালীরই হাতে গড়া। শিখধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নানক বাঙ্গালাদেশ পর্য্যটনকালে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রেম-ধর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীমৎ নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর পঞ্জাবী শিষ্য **রামদাস চৈতন্যধর্ম্ম পঞ্জাবে প্রচার করিয়াছিলেন** এবং মূলতানে মদনগোপালের অনুরূপ একটি মন্দির ও বিগ্রহস্থাপন করিয়াছিলেন। বহু পঞ্জাবী চৈতন্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন।

"পঞ্জাবী" পত্রের প্রথম সম্পাদক বাঙ্গালী। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে পঞ্জাবে "আর্য্য-সমাজ" স্থাপিত হয়। তাহার প্রথম সহকারী সভাপতি হন বাঙ্গালী সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। সারদাবাবু ও নবীনচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে পঞ্চনদে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আর্য্যসমাজের অঙ্কুর উদ্‌গত হয়। নবীনবাবু, রায় বাহাদুর চন্দ্রনাথ মিত্র,

মাননীয় বিচারপতি সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ১৮৮৫ খৃঃ **পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়। প্রতুলবাবু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রবাবুর চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। চন্দ্রবাবুর জামাতা অবিনাশ মজুমদার একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধরমপুর যক্ষ্মানিবাস প্রতিষ্ঠার তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। লাহোরের মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙ্গালী। পঞ্জাবের "ট্রীবিউন" পত্রিকাও বাঙ্গালীর সম্পাদকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেদিন পর্য্যন্ত কালীনারায়ণ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই পঞ্চনদেই বাঙ্গালীর সহিত পঞ্জাবীদের অনেকগুলি আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

লাহোরের পর রাওলপিণ্ডি। এক সময়ে এখানেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক ছিল। সমর বিভাগীয় প্রধান দপ্তরখানা এখান হইতে উঠিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা বর্ত্তমানে খুব কমিয়া গিয়াছে। এখানকার ডাক্তার, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, কেরাণীগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। আরসিনাল অফিসের হেডক্লার্ক, ২৪ পরগণার পাণিহাটি গ্রাম নিবাসী ৺অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় এখানে "ডেনিস্ স্কুল" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীরা এখানে দুইটি লাইব্রেরীও স্থাপন করেন।

কলিকাতা যখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল তখন অনেক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সিমলায় আগমন হয়। এখানেও কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ী আছে। এখানেও বাঙ্গালীরা বালকদিগের ও বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

পঞ্জাবের এমন জেলা নাই যেখানে বাঙ্গালীরা আসে নাই। দেশীয় রাজ্য-সমূহেও বাঙ্গালীরা এক সময়ে প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন।

রাজপুতনায় বাঙ্গালী—জয়পুরের প্রাচীন নাম ছিল অম্বর, রাজধানীর নাম ছিল 'আমের'। প্রাচীন অম্বরেই বাঙ্গালীর আগমন হয়। বাক্‌লার কেদার রায়ের "শীলাদেবী" মানসিংহ কর্ত্তৃক অম্বরে নীত হয়। দেবীর সহিত বাঙ্গালী পূজারী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এখানে আসেন। প্রভাবতী নাম্নী কেদার রায়ের এক কন্যা অম্বরপতি মানসিংহের মহিষী হইয়াছিলেন।

এই পুরোহিত বংশের **বিদ্যাধর** নামে একটি মেধাবী বালক বুদ্ধি-কৌশলে অম্বররাজ জয়সিংহকে এরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে রাজা তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উচিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কালে এই বিদ্যাধরই রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হন। কি জ্যোতিষ, কি ভূতত্ত্ব, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি পুরাণতত্ত্ব, কি পূর্ত্তবিদ্যা, কি যন্ত্রবিদ্যা, কি রাজনীতি—সকল বিষয়েই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। "যে জয়পুর নগর আজি শোভা সৌন্দর্য্যে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধরই আঁকিয়া দিয়াছিলেন।" জয়পুর সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণ-পরিপাট্যে ভারতবর্ষ মধ্যে সুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া জগতের সকল ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। রাজস্থানের লেখক কর্ণেল টড্ এই নগরীর বিন্যাস বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজা জয়সিংহই কাশী প্রভৃতি স্থানে মানমন্দির স্থাপন করেন। এ সকল বিষয়ে বিদ্যাধর তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। রাজনীতি বিষয়েও তিনি বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। যখন উদয়পুরের রাণা বিশ্বাস-ঘাতক মন্ত্রীর সাহায্যে জয়পুর রাজ্য করতলগত করেন তখন অতিবৃদ্ধ বিদ্যাধর অবসর ভোগ করিতেছিলেন। শত্রুসৈন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে জয়পুররাজ ঈশ্বরীসিংহ আত্মহত্যা করেন। রাণীগণ এই বিপদে বিদ্যাধরের শরণাপন্ন হন। ঝুড়ি করিয়া বৃদ্ধ রাজান্তঃপুরে আনীত হইলে একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে তিনি বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে বন্দী করেন এবং পরে রাণাকেও বন্দী করিয়া নিজ ইচ্ছামত সর্ত্তে সন্ধি করিয়া লন। এইরূপে রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের সিংহাসন বিনা রক্তপাতে বাঙ্গালীর

বুদ্ধিকৌশলে রক্ষা পাইয়াছিল। বিদ্যাধর শাণ্ডেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বংশধর। তাঁহার প্রপৌত্রের পৌত্রের নাম স্থরজবক্সে পরিণত হইয়াছে।

২৪ পরগণার শ্যামনগরবাসী স্বর্গীয় **কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** জয়পুর স্কুলের উন্নতি সাধন মানসে জয়পুরে নীত হন। পরে সেই গ্রাম্য স্কুল মাষ্টার প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। এ রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তিনি জয়পুররাজ্যকে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া রাজসরকারকে উচ্চপদ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। জয়পুরে কান্তিবাবুর "বান্দা", প্রাসাদ ও তাঁহার পত্নীর ছত্রী (স্মৃতিসৌধ) দর্শনীয় বস্তু। কান্তিবাবু বহু বাঙ্গালীকে জয়পুরে আনিয়াছিলেন ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর সংসারচন্দ্র সেন প্রধান মন্ত্রী হন।

রাজপুতনার অন্যান্য রাজ্যেও বাঙ্গালী-প্রতিভার সম্যক্ আদর হইয়াছিল। কেরৌলিতে রায় বাহাদুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ভরতপুর যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনানায়ক হত হইলে কালীচরণ ঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী সেনাপতির পোষাক পরিয়া সৈন্যচালনা করিয়া নিশ্চিত পরাজয়ের পরিবর্ত্তে জয়শ্রী বরণ করেন এইজন্য তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি জেনারল কালু ঘোষ নামে খাত হন। সাধারণে তাঁহাকে "জেনারল কালুর" অপভ্রংশে **"জঁাদরেল কালু"** আখ্যা দিয়াছিল। ভরতপুর, ঢোলপুর, উদয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যে অনেক বাঙ্গালীই রাজাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, রাজচিকিৎসক প্রভৃতি সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত এ, সি, দাস বর্ত্তমানে মর্ভি এষ্টেটের প্রধান ইলেক্‌ট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার। ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার যোধপুররাজের চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আওরাঙ্গজেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবন লুণ্ঠিত হইবার সময় বহু বাঙ্গালী গোস্বামী রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

মধ্যভারতে এবং মালবে—যথা, গোলিয়র, ভূপাল, উজ্জয়িনী, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রাধান্য এক দিন খুবই বাড়িয়া ছিল। বর্ত্ত-

মানে গোয়ালিয়রে অনেক বাঙ্গালী কৃষিকার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রবাসী হইয়াছেন। গোয়ালিয়র সঙ্গীত চর্চ্চার একটি বিশিষ্ট স্থান। একদা তানসেন-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে তানসেনের সমাধিস্থলে বহু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ হয়। একজন গায়ক একটি নূতন সুরে আলাপ করিলে শ্রোতারা বুঝিতে না পারিয়া হট্টগোল করিতে থাকেন। তখন একজন বাঙ্গালী উঠিয়া ঐ সুর 'কুকুভ' রাগিণী বলিয়া ঘোষণা করেন। তখন সকলে বিস্মিত হয় এবং তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞানের সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। এই বাঙ্গালীর নাম **প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর**। তিনি এই সময় স্ত্রী বিয়োগে কাতর হইয়া প্রবাস-ভ্রমণ করিতেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম-ভারতে—করাচী প্রধান বন্দর। এখানে বাংলার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছে। মাউন্ট আবুতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী উচ্চ ও সম্মানার্হ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরে কোহীস্থান, ওয়াজীরী-স্থান প্রভৃতি স্থানেও চাকুরী উপলক্ষে বাঙ্গালীর আগমন হইয়াছে। কিছুদিন হইল প্রত্নতত্ত্ববিৎ ননীগোপাল মজুমদার এইখানেই খনন-কার্য্য পরিদর্শনকালে আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

হিমালয় প্রদেশে বাঙ্গালী—কাশ্মীরে বাঙ্গালীর আবির্ভাব প্রাচীন-কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আনিয়া গুপ্তহত্যা করেন। এজন্য ক্রোধান্বিত গৌড়ীয়গণ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ করে এবং বীরের ন্যায় অগণিত কাশ্মীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক একে সমরশায়ী হয়। পরবর্ত্তী কালে জয়াপীড় নামক কাশ্মীরপতি গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীকে বিবাহ করেন। তিনি গৌড়ের কার্ত্তিকেয় মন্দিরে কমলা নাম্নী এক নর্ত্তকীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকেও বিবাহ করিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান। তিনি দুই রাণীর নামেই দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। যখন রাজা উদয়নদেব কাশ্মীরের অধিপতি সে

সময় জক্দার খাঁ কাশ্মীর আক্রমণ করিলে রাজা পলায়ন করেন এবং রতঞ্জবু নামক তিব্বত হইতে নির্ব্বাসিত জনৈক বৌদ্ধ রাজ্য অধিকার করেন। পরে কাশ্মীরের পণ্ডিতরা বৌদ্ধ কখনও হিন্দুত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া রায় দিলে, রতঞ্জবু বাধ্য হইয়া ফকীর বুলবুল সাহের নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মুসলমান ধর্ম্ম এইরূপে রাজধর্ম্মে পরিণত হইল, এবং কালে কাশ্মীরের দশ ভাগ লোকের মধ্যে নয় ভাগ মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীর মোগল আমলে সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহৃত হইত। বীরকেশরী রঞ্জিত সিংহ কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কাশ্মীর দখল করিলে গুলাব সিং ৫০ লক্ষ টাকায় ইংরাজদিগের নিকট হইতে কাশ্মীর ক্রয় করিয়া পুনরায় হিন্দু রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন।

আধুনিককালে **নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়** কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ঋষীবর বাবু প্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেন। পরে তিনি জম্মুর গভর্ণর পদ প্রাপ্ত হ'ন। কোন্নগরের ডাঃ আশুতোষ মিত্র চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মন্ত্রীপদও লাভ করিয়াছিলেন। হুগলী ভদ্রেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় জম্মুর "প্রিন্স অফ ওয়েলস্" কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া লাহোরে বাস করিতেছেন। রায় বাহাদুর ললিতচন্দ্র বসু কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান ইলেকটিক্ ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন।

নেপালে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে **কাপ্তেন রাজসিংহ** বিশ্বাস সর্ব্বপ্রথম আসেন। তিনি নেপালে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার পদে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি উন্নতিকামী প্রত্যেক যুবকের আদর্শস্থল। তিনি হওড়া জেলায় দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ঘটে নাই। বাল্যে মাত্র ৭৲ বেতনে Garden Companyর কারখানায় নিযুক্ত হন। পরে পলতার জলের কলে, ঘুস্থড়ির পাটকলে, বালীর কাগজের কলে, কাশীপুর গন ফাউণ্ড্রি ও দমদম গোলাগুলির কারখানাতে কাজ করেন। শেষোক্ত স্থানে

তিনি গোলাগুলি তৈয়ার করিতে শেখেন ও তাঁহার মাহিনা হয় একশত টাকা। এখান হইতে তিনি ১৫০৲ বেতনে নেপালে ভাগ্যান্বেষণে যান। সেখানে তিনি গোলাগুলি প্রস্তুতে পারদর্শিতা দেখান কিন্তু ঈর্ষাপরবশ লোকের চক্রান্তে তাঁহাকে চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া পুনরায় ৪০৲ বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় কাবুলের আমীরের কর্ম্মে ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত হইয়া কাবুল যাত্রা করেন। সেখানে আড়াই বৎসর কর্ম্ম করিয়া আমীরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া পুরস্কৃত হন। দেশে আসিয়া পুনরায় ২০০৲ বেতনে নেপালে গমন করেন। সেখানে নূতন যন্ত্রপাতি আনাইয়া কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাজাকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে Captain পদবীতে উন্নীত করা হয়। নেপালে তিনি প্রথম বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালাইয়াছিলেন। তিনি পারদর্শিতার সহিত মেসিন্‌গানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নেপালে বহু বাঙ্গালীই প্রবাসী হইয়াছেন এবং ডাক্তার, অধ্যাপক প্রভৃতি সম্মানীয় পদে নিযুক্ত আছেন।

বিহার ও উড়িষ্যা—খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাংলার সহিত বিহার ও উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুরীই বঙ্গের প্রধান তীর্থ এবং জগন্নাথদেব বাঙ্গালীর প্রাণের দেবতা। **বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দিরের ব্যবস্থা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।** পুরী ও ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর অনেক কীর্ত্তি আছে। চৈতন্যদেব বঙ্গ ও উড়িষ্যাকে এক স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্যান্বেষী বহু বাঙ্গালী উড়িষ্যা প্রদেশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উড়িষ্যার স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালী শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের দান অসীম।

বিহার ও ছোটনাগপুরে চৈতন্যের সময় হইতে বাঙ্গালী প্রাধান্য দেখা যায়। ভাগলপুরে "মহাশয় বংশ," বাঁকীপুরে "ঘোষ বংশ," পাটনায় "ঘোষ বাবুরা," মজঃফরপুরের "মুখুয্যে বংশ," ছাপরার "গুপ্তবংশ," গয়ায় "কুহিলা বংশ" বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী চাকুরিয়া, ডাক্তার,

ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার, ও ব্যবসাদারে বিহার ছাইয়া গিয়াছে। স্কুল ও কলেজ স্থাপনে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, শিল্প শিক্ষা প্রচারে, বাঙ্গালীই চিরদিন অগ্রণী। এক কথায়, বিহারের আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উদ্যোক্তা বাঙ্গালীই। কিন্তু আজ ক্ষমতা পাইয়া বিহারবাসী সে উপকার ভুলিতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানে মিঃ পি, আর, দাস বাঙ্গালী সমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ—বর্ত্তমানে পি, ব্যানার্জ্জী আহম্মদাবাদে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ এ, সি, দাস বোম্বাইএর সর্ব্বজনখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ বিমানচন্দ্র দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদ লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে বহু বাঙ্গালী প্রবাসবাস করিতেছেন।

মন্তব্য—বাঙ্গালীর দিকে দিকে বিজয় অভিযানের দিনে তাহার উন্নতির মূলে যে প্রেরণা ও দার্ঢ্য ছিল তাহা ভুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর প্রবাস অভিযান ইংরাজ আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সে কালে যানবাহন অভাবে প্রবাসী বাঙ্গালীকে বহু কষ্টে, অনেক সময় পদব্রজে, দেশ দেশান্তরে যাইতে হইয়াছে। চোর ডাকাতের উপদ্রব ছাড়া সিপাহীযুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে অকারণ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রবাসীরা ছিলেন প্রায়শঃই গরীবের সন্তান, অভাব ও কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত। প্রবাসী বাঙ্গালী চরিত্রগুণে, সদাচারে, পরোপকারিতায়, সততায়, তেজস্বিতায়, বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে ভিন্ন প্রদেশীয় অধিবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্কুল ও কলেজ স্থাপন দ্বারা, সংবাদপত্র সম্পাদনার দ্বারা, সভাসমিতি স্থাপন ও অনুষ্ঠান করিয়া স্থানীয় লোকের সম্মুখে সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া তত্তদেশীয় লোককে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন,—সকলের উপরে সেবার দ্বারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। বাঙ্গালীকে বড় থাকিতে হইলে সেই সকল গুণের অনুশীলন ভুলিলে চলিবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

বিদ্যানুরাগ—হুয়েন সাং লিখিয়াছেন বাঙ্গালার ছাত্র সুদূর অতীতে কাশ্মীর, তক্ষশীলা প্রভৃতি দূরদেশে শিক্ষালাভের জন্য যাতায়াত করিত। ক্ষেমেন্দ্রও একথার পরিপোষক উক্তি করিয়াছেন। আজও এ প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

স্বভাব ও নৈতিক চরিত্র—ইৎসিং বলেন বাঙ্গালীর নৈতিক চরিত্র খুব উচ্চাঙ্গের বলিতে হইবে। হুয়েন সাং বলেন উহারা সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু, সাধু প্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাবসম্পন্ন কিন্তু সময় সময় হঠকারিতার পরিচয় দেয়। ক্ষেমেন্দ্র উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, যে বাঙ্গালী যুবকরা ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়, তাহারা বিদ্যালাভার্থ কাশ্মীর গিয়া একটু শারীরিক উন্নতি করিতে না করিতেই কথায় কথায় ছুরী বাহির করিয়া মারামারি করিতে চায়'।

চিন্তায় স্বাধীনতা—ভারতের অন্যান্য জাতি হইতে বাঙ্গালীর যে অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কপিলের সাংখ্যমত বাঙ্গালীর নিজস্ব। সাংখ্য চিন্তার ও বিচার শক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ইহা সর্ব্বশক্তিমান কোন ঐশী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি সমাজ জীবনে, কি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভাঙ্গা-গড়া চিরদিনই চলিয়াছে। তাই আমরা বাঙ্গালা দেশে এত ধর্ম্মসম্প্রদায়, এত রাজনৈতিকদল দেখিতে পাই,—সমাজ জীবনে এত প্রগতি অনুভব করি। অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে স্বাধীনতা অর্থে স্বৈরাচার বুঝায় না, বা স্বাধীন চিন্তার অজুহাতে ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আত্মঘাতী হওয়াও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

ধর্ম্মানুরক্তি ও নৈতিক উৎকর্ষতা—অনার্য্যরা জন্মান্তরবাদী ছিল—পাপস্খালন না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের জননী জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে, এই ধারণা তাহারা পোষণ করিতেন। ঋগ্বেদে জন্মান্তর নাই। আর্য্যেরা পরবর্ত্তীকালে এ ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কপিল এ জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং চিন্তা ও বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শন লাভই একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের ভিত্তি সাংখ্যদর্শনের উপর। সেই-জন্য বোধ হয় মহাভারত ধর্ম্মভীরু ও নীতিপরায়ণ বাঙ্গালীর প্রিয়। মহা-ভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যমতের উপর লিখিত। অন্য প্রদেশে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণই বহুল পরিমাণে লোকপ্রিয়।

ত্যাগ ও বৈরাগ্য—সাংখ্য দর্শনের উপর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি। "আজিও অর্দ্ধজগৎ জুড়িয়া" যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত আছে তাহা বঙ্গ-মগধের "প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি ও প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বঙ্গ ও মগধে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সেরূপ আর কোথাও করে নাই। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্মের প্রতিকূল। দুইটি ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদে ও সূত্রগুলিতে মাত্র গৃহস্থের ধর্ম্মের কথাই আছে। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতেছে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর, উহাতে কেবল দুঃখ। এই ধর্ম্মগুলির সহিত আর্য্যগণের আচার ব্যবহারেও মিল নাই। আর্য্যগণ বলেন পরিষ্কার কাপড় পরিবে, জৈনেরা বলেন উলঙ্গ থাক, গায়ের ময়লা তুলিও না। আর্য্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন, বৌদ্ধেরা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্য্যরা টিকি রাখিতেন, বৌদ্ধেরা সব মাথা

মুড়াইয়া ফেলিত। আর্য্যগণ দিনে ও রাত্রে একবার করিয়া খাইতেন, বৌদ্ধেরা ১২টার মধ্যে আহার করিত, ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আহারই হইত না। আর্য্যগণ খাট ছাড়া শুইতেন না, বৌদ্ধেরা মাটিতে শুইয়া থাকিতেন। আর্য্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন, বৌদ্ধেরা নিজ দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিতেন।" ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "এ সকল অভ্যাস বৌদ্ধ ও জৈনেরা উত্তর বা দক্ষিণ হইতে পায় নাই, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর যে ১২ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন, তাহা পূর্ব্বাঞ্চলেই কাটাইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি পরেশনাথ পাহাড়ে (সাঁওতাল পরগণায়) বাস করিয়াছেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই (পরেশনাথ পাহাড়) বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। সাংখ্যমত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যমত পূর্ব্বাঞ্চলের।"

সাংখ্যমতের উপর ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধ ও জৈনমত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা প্রচার করে, সেই ধর্ম্ম দুইটি একদিন বাঙ্গালায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আজও সেই মনোবৃত্তি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। বর্ত্তমান যুগে লালাবাবুর বৈরাগ্য; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশ সেবায় ত্যাগধর্ম্মপালন, সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুককের দেশসেবায় মৃত্যু ও কারাবরণ বাঙালী জাতির চিরন্তন সংস্কারের অভিব্যক্তি মাত্র।

দেবতার রূপ—অনেক সভ্যজাতির মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঈশ্বরকে দেবীরূপে আরাধনা করিবার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। বাঙ্গালী অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঈশ্বরকে দেবী বা শক্তিরূপে ধারণা করিত। সাংখ্য "প্রকৃতি" হইতেই জগতের উদ্ভব ঘোষণা করিয়াছে। মিথিলা ব্যতিরেকে মাত্র বাঙ্গালায়ই শক্তি উপাসনা প্রচলিত—দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি শাক্তগণের ইষ্টদেবী। অন্যান্য প্রদেশে শাক্তগণের স্থানে শৈবরাই প্রবল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীন ও সমুদয় ভারতবর্ষেই প্রচলিত। উত্তর ভারতে বৈষ্ণবগণের ইষ্টদেবতা হইতেছেন রাম-সীতা, দাক্ষিণাত্যে তিনিই লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতা হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে বাঙ্গালী গোস্বামীগণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেও রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে।

ব্যবহারবিধি ঃ উত্তরাধিকার—ধর্ম্মবিষয়ে যেমন বাঙ্গালার বিশেষত্ব দেখা যায়, ব্যবহার বা উত্তরাধিকার বিষয়েও সেইরূপ বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য আছে। "মিতাক্ষরা" নামক স্মৃতি নিবন্ধ অনুসারে সম্পত্তির মালিক এক-জন নহে। পিতার বর্ত্তমানে পুত্র বা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিলে তদ্দণ্ডেই তাহারা সম্পত্তির মালিক হয়। তাহাদিগকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এই "মিতাক্ষরা" আইন বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের সকল প্রদেশেই প্রচলিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে "দায়ভাগ" আইনের ব্যবহার। ইহা অনুসারে পিতা পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, পিতার জীবিতকালে পুত্র বা পৌত্রের উহাতে কোন দাবী নাই এবং তাহারা পিতার ইচ্ছানুসারে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেও পরে। "মিতাক্ষরায়" স্ত্রীলোক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না ঃ মাত্র স্বামীর ভ্রাতাদের নিকট ভরণ-পোষণের অধিকারী হয়। "দায়ভাগে" স্বামী অপুত্রক মৃত হইলে স্ত্রী যাবজ্জীবন সম্পত্তি ভোগ করিতে পায় এবং স্বামীর পিণ্ডদান-খরচ-কারণ সম্পত্তি দায়বদ্ধ এমন কি বিক্রয় করিতেও পারে। বাঙ্গালাদেশের এই "দায়ভাগ" জীমূত-বাহনের শাস্ত্র ব্যাখ্যার ফল। কেহ কেহ মনে করেন জীমূতবাহন বাঙ্গালাদেশে নূতন ও পৃথক উত্তরাধিকার আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। বাঙ্গালাদেশে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিভাগ চিরদিনই স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। জীমূতবাহন কেবল নূতন শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন। রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বলেন, "বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ গোড়ায়

বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।”

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব—বাঙ্গালীর অন্তর কোমল, মধুর, স্নিগ্ধ। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব আর কোথাও নাই। বাঙ্গালীর সুকোমল কণ্ঠের আগমনী আর কেহ গাহিতে পারে না। চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনীরূপও বাঙ্গালায় কি শান্ত কোমলভাব ধারণ করিয়াছে,—ভীমা ভীষণা মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। পার্শ্বে সৌম্যা বিদ্যাদায়িনী বাণী ও চঞ্চলা কমলদলবিহারিণী কমলা—বাঙ্গালীর স্নেহরসের মানসী প্রতিমা দুইটি। নিম্নে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ও সিদ্ধিদাতা গণপতি, শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে স্নেহ মধুর মানবীয় বেশে যেন তাঁহারা বঙ্গবাসীর প্রাণময় আতিথ্য গ্রহণ করিতে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন। এ কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব। রুদ্রে ও মধুরে এত সামঞ্জস্য করিতে আর কোন জাতি পারে নাই। বাঙ্গালীর দেবদেবী প্রতিমার কোমল-মধুর ভাব ভারতের আর কোন জাতির দেবদেবীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সহস্রাধিক বৎসর হইতে বাঙ্গালী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রদেশে দুর্গাপূজার স্থানে “দশেরা” উৎসব বা “নবরাত্র” উৎসব হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের দশম ঋকে (দেবীসূক্ত) প্রথম শক্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর গান—বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য-গীতি ও ছড়া, কথা ও গান, বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সম্পদ। সারি গান, কবির গান, চণ্ডীর গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, হরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি বহু প্রকারের গান বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান, বৈষ্ণব কীর্ত্তন, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সম্পদ। বর্ত্তমান যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির সুললিত সঙ্গীত সমস্ত ভারত মুখরিত করিয়াছে।

বাঙ্গালীর শিল্প—বাঙ্গালীর স্থাপত্য-শিল্প সুরুচি কল্পিত। সূক্ষ্ম বয়ন-শিল্পে বাঙ্গালী জগজ্জয়ী—মসলিন্ এক বাঙ্গালীই বুনিতে পারে। বাঙ্গালায় স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—বঙ্গীয় গজদন্তের কারুকার্য্য জগতে অতুল। বাঙ্গালার প্রস্তর-প্রতিমা, বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন।

বাঙ্গালীর স্বভাবজ শিল্পী-মনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালাদেশের কুটিরশিল্পে আমরা মহেঞ্জোদারো, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থ-রেণু প্রচুররূপে পাইতেছি। পাষাণের গায়ে, কাষ্ঠে, বস্ত্রে, তূলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাঁথা-শিল্পে, আলপনা—ক্ষীর ও নারিকেলের মেঠাই, দেয়াল-চিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবাতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাদুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও ধাতব তৈজসপত্রে, এমন কি বিছানা বাঁধিবার দড়িতে, পুঁতির কাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নরমুণ্ড, অস্ত্রের বাঁট, থলে, আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি তাহা সুচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে।"

নানাবিষয়ে বিশিষ্টতা—বাঙ্গালীর কোন 'শিরোভূষণ' নাই, ইহা বৌদ্ধ-জৈন যুগের আচার হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেতর জাতির মস্তকে 'শিখা' নাই। ক্রিয়াকর্ম্ম ও যজন-যাজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সাধারণ ব্রাহ্মণও প্রায় 'শিখা' রাখেন না। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রত্যেক হিন্দুই 'শিখা' রাখেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মুণ্ডিত মস্তক হইতে বাঙ্গালায় এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ড,—কবিওয়ালাদিগের ঢোল বোধ হয় প্রাচীন যুগের মাদলের ক্রমবিবর্ত্তন। কীর্ত্তনের শ্রীখোল বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তির চরম পরিচায়ক।

বাঙ্গালীর গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অভিনব। দুই চালা, চারি চালা, আট চালা ও বারদুয়ারী ঘর আর কোথাও নাই। বাঙ্গালার বাহিরে কুটিরের ছাদ এক চালা। উহা প্রাচীরের উপর স্থাপিত না হইয়া প্রায় দুই তিন ফুট নিম্নে অবস্থিত হয়। ফলে বর্ষার জলে প্রাচীর প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং উহার শীর্ষদেশে এত গাছপালা জন্মায় যে দূর হইতে 'পোড়ো' বাড়ি বলিয়া মনে হয়। বৃষ্টির জলও উহাতে আটকায় না। শোভা ও শ্রীর ত কথাই নাই।

বাঙ্গালায় যানবাহনাদি স্বতন্ত্র প্রকারের। বাঙ্গালার ঢাকা ঘোড়ার গাড়ী আর কোথাও নাই। ইহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত অবরোধ প্রথার ফল। নদী মাতৃকা বঙ্গের দ্রুতগামী 'ছিপ' বাঙ্গালাদেশের আর একটি বিশিষ্ট যান।

বাঙ্গালীর বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি, * বঙ্গনারীর "উলুধ্বনি" ও সীমন্তে সিন্দুর ব্যবহার, মৎস্যাহার-রীতি, † দশবিধ সংস্কারের অভিনবত্ব, অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ পদ্ধতি, দেবালয়ে শুদ্ধাচার, অসংখ্য দেবদেবীর পূজা ও তাঁহাদের মূর্ত্তি কল্পনা, তন্ত্রের প্রাধান্য, বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালাকে অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

---

* প্রাচীন বঙ্গে পুরুষরা 'ধুতী' ও স্ত্রীলোকেরা 'শাড়ী' পরিত। হাঁটুর নীচে সাধারণতঃ ধুতী নামিত না, শাড়ী নামিত। ধুতীর মধ্যভাগ কোমরে কোমরবন্ধ দ্বারা বাঁধা থাকিত ও দুই শেষার্দ্ধ কাছা করিয়া গোঁজা হইত বা একটি অগ্রভাগ কাছা ও অন্যটি কোঁচা হইত। শাড়ীও সেইভাবে পরা হইত। কখনও দেহের উর্দ্ধভাগ ঢাকিতে উহা ব্যবহৃত হইত না। সেজন্য কখনও কখনও ওড়না, বা ছোট জামা ব্যবহৃত হইত।

† ভবদেব ভট্ট মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, বঙ্গে মৎস্যাহার দোষাবহ নহে। চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিতে মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ আঁশবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ মৎস্য ভক্ষণ করিবে। জীমূতবাহন ইলিশ মাছের তৈল উদ্ভিজ্জ তৈলের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

বৃহদ্বঙ্গ ব্যতিরেকে ধান্যের আর কোথাও চাষ হয় না। সমগ্র পৃথিবীতে এক বৃহদ্বঙ্গ ব্যতীত 'পাট' বড় কোথাও জন্মায় না। খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে 'গুড়' প্রস্তুত আজও ভারতবর্ষ বাঙ্গালীর নিকট শিখিতেছে। ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'চা' বাঙ্গালায় জন্মায়।

বাঙ্গালায় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি, উত্তর ভারতের বৈদিক সভ্যতা হইতে চিরদিনই বিভিন্ন ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাস্কর্য্য-স্থাপত্য-সম্পদ্-শিল্প-বাণিজ্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান

১। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য

ইহার অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনার্য্যরাই বোধ হয় বাঙ্গালার আদি ভাস্কর। সম্ভবতঃ তাহারাই মহেঞ্জোদারোর ছবি আঁকিয়াছিল, প্রস্তর নির্ম্মিত বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং শিল্পকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই যে বাঙ্গালার নমঃশূদ্ররা "চাষা নাগরী" জানিত তাহারা কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর ও বহুযুগপূর্ব্বকার শিল্পসংস্কার বহন করিয়া আসিয়াছে? নতুবা মহা মহা পণ্ডিতগণ যে ভাষা বুঝিতে অক্ষম তাহা বুঝিতে নমঃশূদ্রর নিকট শরণ লইবার হেতু কি?"

বাঙ্গালী ভাস্কর্য্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন পালযুগ হইতে পাওয়া যায়। যখন "মাৎস্য-ন্যায়" দ্বারা দেশ একান্ত প্রপীড়িত, মৎস্য বিশেষের ন্যায় প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিতেছে, তখন বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে "রাজা" নির্ব্বাচন করে। তিব্বতীয় লামা তারানাথের বিবৃতি হইতে আমরা এই রাজ-নির্ব্বাচন ঘটনা জানিতে পারি। এইরূপে রাষ্ট্রীয় শান্তি স্থাপিত হইলে গৌড়ে ললিতকলার উৎকর্ষলাভ আরম্ভ হয়। ধর্ম্মপালদেবের সময় ভাস্কর্য্য-শিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করে। নবম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ভাস্কর্য্য-শিল্পের গৌরবের যুগ। নবম শতাব্দীতে বরেন্দ্রের (উত্তর বঙ্গের) ভাস্কর ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীটপাল বঙ্গীয় ভাস্কর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা

করেন। পর্ব্বতগাত্রে তাঁহারাই বিক্রমশীলা বিহার খোদিত করেন। সম্ভবতঃ নালন্দা-বিহারের ভাস্কর্য্য তাঁহাদেরই পরিকল্পিত। সেনরাজবংশীয় বিজয় সেনের রাজত্বকালে শূলপাণি নামক ভাস্কর "রাণক" উপাধি লাভ করেন এবং বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলিয়া গণ্য হন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ আছে যে, বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য্যকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। গৌড়ের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (রাজসাহী) যাদুঘর ও বঙ্গের (ঢাকার), মগধের (নালন্দা ও পাটনা), এবং সমতটের (কলিকাতা যাদুঘর ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার) যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। সেই নিদর্শনগুলি অনুধাবন করিলে আমরা এই কয়টি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই যে—নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার একটি নিজস্ব ভাস্কর্য্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বঙ্গীয় স্কুলের (ঘরের) আদর্শ বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। যবদ্বীপে সিংহেশ্বরীর নিকট প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, বরবুদর মন্দির গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি ও কারুকার্য্য, এবং কণারক মন্দিরের ভাস্কর্য্য বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। লৌহ, পিত্তল প্রভৃতির ঢালাইকার্য্য ধীমান ও বীটপালের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার কোণারকের স্থাপত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা "চারি শতাব্দীর স্থাপত্য সাধনার পুঞ্জীভূত অভিব্যক্তি, বঙ্গীয় স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।" ব্রাউন নামক জনৈক ইংরাজ আই, সি, এস্ কণারকের বিরাট লৌহ কড়ি দেখিয়া বলিয়াছেন, "য়ুরোপে বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে কখনও এতবড় লৌহ কড়ি প্রস্তুত হয় নাই।"

বাঙ্গালার নিজস্ব স্থাপত্যের রূপ গুপ্তযুগ হইতে পৃথক। গুপ্তযুগের মূর্ত্তিগুলি সাদাসিধা, কড়া নিয়মকানুনে বাঁধা এবং গম্ভীর ও কঠোরদর্শন। পাল-যুগের বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য কোমল, লীলায়িত এবং ভাস্কর্য্যের আইনকানুন কতকটা স্বীকার করিয়া লইলেও মানবীয় ভাবাপন্ন। বঙ্গীয় ভাস্কর দেবতার কথা ভুলিয়া তাহার মর্ম্মের মানবীয় স্পর্শ দিয়া দেবমূর্ত্তি গড়িত। কঠিন কৃষ্ণ

প্রস্তরের গাত্রে যন্ত্রের প্রতি আঘাতে শিল্পী তাহার মনোভাব মূর্ত্ত করিয়া তুলিত। ভাবুকতা ছিল শিল্পের মূলধন, লীলায়িত রেখাপাতে শিল্পী তাহার মূর্ত্তিতে দিত প্রাণের অনুভূতি। নিপুণ ভাস্কর প্রস্তর মূর্ত্তির গণ্ডে দিত হাসি, নাসিকায় নিঃশ্বাস, অঙ্গে চেতনা—মুখের ভাষা কাণে শুনা যাইত না বটে কিন্তু প্রাণে আসিয়া স্পন্দন জাগাইত। প্রাণহীন মূর্ত্তি বাঙ্গালী গড়িতে জানিত না, স্ত্রীলোকের (প্রকৃতি) মূর্ত্তি গড়িতে বাঙ্গালী ভাস্কর বিশেষ পটু ছিল। হাস্যে, লাস্যে, ভঙ্গিতে, সুষমায় বাঙ্গালী ভাস্করের নারীমূর্ত্তি অনবদ্যরূপ গ্রহণ করিত। অবশ্য ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, ধর্ম্মসম্প্রদায়গত পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি ও তন্ত্রাদিতে কল্পিত বিভিন্ন দেবদেবীর বিভিন্ন ধ্যানমূর্ত্তি অনুসারে ও দেশকাল-পাত্র ভেদে মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তিগুলি গুপ্তযুগ হইতে আকারে একটু ছোট হইয়া যাইলেও, রূপে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মপালদেবের সময় ভাস্করদিগের এরূপ প্রতি-পত্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল যে গৌড়ের উজ্জ্বলা নামক প্রস্তর-শিল্পীর পুত্র কেশব বহু অর্থব্যয়ে একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন ও শিব মন্দির স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়ের ভাস্কর কাশী, বৃন্দাবন, মথুরায় দেবমূর্ত্তি খোদিত করিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইত। কাশীখণ্ডে নয়ন ভাস্করের উল্লেখ পাওয়া যায়। নদীয়ার কারিগরগণও কাশী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে আদর পাইত। মুসলমান যুগে বিগ্রহ মূর্ত্তির লাঞ্ছনা ও মন্দিরাদি ধ্বংসের এরূপ প্রকোপ বৃদ্ধি পায় যে ভাস্কর্য্য শিল্পের দ্রুত অধঃপতন হয়। সে সময় নেপাল, কামরূপ ও স্বাধীন উড়িষ্যায় বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ক্রমশঃ এই ভাস্কর্য্য শিল্প বাঙ্গালায় লোপ পাইল। বর্ত্তমানে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা ইহার পুনর্জ্জীবন দানের চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতার কুমারটুলির পটুয়ারা এই শিল্পের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। দাঁইহাট এখনও ভাস্কর্য্যের জন্য খ্যাত।

২। বাঙ্গালার স্থাপত্য

প্রাচীন গৌড়ের হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে খনন কার্য্য দ্বারা যদি কোন স্থাপত্য-রত্নের লুপ্তোদ্ধার হয় তবেই প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইবে। পাঠানগণ বঙ্গে আসিয়া বহুদিন সুস্থির হইতে পারেন নাই, হিন্দুরাও দারুণ সন্ত্রস্তভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন। তাই সেকালের ঘরবাড়ী আত্মরক্ষার দিক দিয়া প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইত, যথা পাঠাননির্ম্মিত গৌড়ের "লুকোচুরি" তোরণ দুর্গ, এবং হিন্দু ত্রিপুরার 'সপ্তরত্ন মন্দির।' ঐ মন্দিরের আগম নির্গম পথগুলিও একটা দুরন্ত হেঁয়ালী। বঙ্গের নিজস্ব কল্পনা "বারদুয়ারী" ঘর, বঙ্গের দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট ঘর প্রভৃতির আদর্শ গৌড়ীয় সুলতানগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের সোণা-মস্‌জিদ, বারদুয়ারী, কদমরসুল (উর্দ্ধস্থিত-গম্বুজ বাদ দিয়া) প্রভৃতির হিন্দু মন্দির হইতে কোন পার্থক্য নাই। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মস্‌জিদ একটি হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর মাত্র, উহা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক হিন্দু মন্দিরেরই এই দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।—ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে পারস্য শিল্পপ্রভাব বাঙ্গালায় আসে নাই। মূল পারস্য স্থাপত্যই হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থপতির নিকট ঋণ করা।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "পাঠান শাসনের শেষ দিকে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের ততটা উৎসাহ ছিল না। এইজন্য অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল মন্দিরে দেবলীলা ও নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু ইহাদের বাহার ছিল কল্কায়······আমার ধ্রুব বিশ্বাস মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালীরা যোগাইত।" দিনাজপুর

কান্তনগরের মন্দির (১৭০৪ খৃঃ নির্ম্মিত), বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির (১৬৭৯ খৃঃ নির্ম্মিত), মহানাদের দোচালা ঘরের মত রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির (১৭০৬ খৃঃ), বারিপদের (ময়ূরভঞ্জ) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী), শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির প্রভৃতি বাঙ্গালার ইংরাজ-পূর্ব্ব যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন ; মন্দির নির্ম্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায়ে জীবজন্তু, নরনারী, ফুল লতার চিত্র উৎকীর্ণ করিত। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর বিশেষভাবে এই ইটে-খোদাই কাজের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইটে খোদাই কার্য্য ও মন্দিরের বাস্তবিদ্যা এখন প্রায় লুপ্ত।

৩। প্রাচীন বাঙ্গালার ধন-সম্পদ্

হীরক—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পর ও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ‘বজ্র’ বা হীরকের আকর ছিল। প্রাচীন যে ছয়খানি রত্ন-পরীক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকখানিতেই দেখা যায় পুণ্ড্রদেশে হীরকের খনি ছিল। একখানিতে বঙ্গদেশেও হীরকের খনি ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ড্রদেশীয় হীরকের বর্ণ সম্বন্ধে বুদ্ধভট্ট লিখিয়াছিলেন, “শ্যামং পৌণ্ড্রভবং।” বরাহমিহিরও তাহাই বলিয়াছেন।

মুক্তা—সিংহলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও মুক্তা উৎপন্ন হইত। রত্ন পরীক্ষা গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশে মুক্তার আকরের কথা উল্লেখ দেখা যায়। ভীমের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সাগরোপকণ্ঠপ্রবাসী রাজগণকর্ত্তৃক মুক্তা উপঢৌকনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তির সন্নিকটে গঙ্গা সমুত্থিত মুক্তা মিলিত। পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়।

স্বর্ণ—উপরোক্ত পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বর্ণখনির

কথা উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ত্রিপুরা কিংবা বর্ত্তমান ছোটনাগপুর অন্তর্গত স্থানে স্বর্ণখনির অস্তিত্ব ছিল।

কয়লা ও লৌহ—বর্ত্তমানে কয়লার ও লৌহের খনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ্।

৪। বাঙ্গালার শিল্প

বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঢাকার মসলীন ও শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই সরু চুড়ির চাহিদা আজকাল বাড়িয়াছে। বিষ্ণুপুরেও শাঁখের কাজ হয়। দাঁইহাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্ত্তির বেশ খ্যাতি এখনও আছে। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ—জীবজন্তুর মূর্ত্তি, চুড়ি, কৌটা, খেলনা ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ শিল্পটি গত একশত বৎসরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ঢাকার রূপার তারের কাজ (Filigree work), কলিকাতার রূপার নকাশীতোলা কাজ (Repousee work), কলিকাতার অলঙ্কার শিল্প ও মীনার কাজ, মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল, কাঁসা ও ভরণের বাসন, দাঁইহাট কাটোয়ার, বোন্পাস-বর্দ্ধমানের, পূর্ব্ববঙ্গের ইসলামপুরের ও নানাস্থানের পিতলের ও কাঁসার বাসন, কলিকাতার পিতল কাঁসার বাসন ও পিতলের দেববিগ্রহ, নবদ্বীপের ঢালাই দেবমূর্ত্তি, পূর্ব্ববঙ্গে মিহি কাপড়ে ফুলতোলা কাশিদা শিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, কোটচাঁদপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের, ধুতি ও শাড়ী, মিহি মখ্মল, কুমিল্লার ময়নামতী শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর ও ছাপা রেশমী শাড়ী, বিষ্ণুপুরের রেশমের—কেটে, চেলি, নকশাদার ও বুটীদার শাড়ী, বীরভূম বাঁকুড়ার রেশমী শাড়ী ও ধুতি, রাজসাহীর মটকা, বীরভূমের কড়িদার তসর, মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ী (অধুনা বিলুপ্ত), কুমিল্লা, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের শীতলপাটী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধানতম কুটীর শিল্প।

আজকাল কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু কল কারখানা ও নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। পাটকল, কাগজের কল, কাপড়ের কল, চাউলের কল, তৈলের কল, লৌহ ও পিত্তল ঢালাইএর কারখানা, মোটরের কারখানা, সাবানের কারখানা, গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধনের কারখানা, সেলুলয়েডের পুতুল ও খেলনার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি কলিকাতার উপকেন্দ্রে স্থাপিত হইয়াছে।

ঢাকার মসলিন—বাঙ্গালীর গৌরব। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও মস্‌লিন সমগ্র জগতে আদর লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মস্‌লিন বিক্রীত হইত। বাইবেলে মস্‌লিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা জিলার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তরদিকে মাত্র ৬৪।৬৫ মাইল স্থানে মস্‌লিনের তূলা জন্মাইত। 'কোটী' বা শিরজ তুলায় মস্‌লিন হইত। ঢাকা জিলার সোণারগাঁও, নোয়াগাঁ, মুড়াপাড়া, কাপাশিয়া প্রভৃতি স্থানে মস্‌লিন বোনা হইত এবং ময়মনসিংহ জিলার বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানেও মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। ঢাকা মস্‌লিনের অর্দ্ধেক আসিত কিশোরগঞ্জ হইতে। সেখানকার তাঁতীরা একুশরত্ন মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তুলা গাছে ফাটিলে তাহাতে ভাল জিনিষ জন্মায় না। বীচির গায়ে যে তুলা থাকে তাহাতেই ভাল কাপড় হয়। এই তুলা পাট করা ও ধুনা খুব সতর্কভাবে করিতে হইত। মস্‌লিনের স্থতা ধৈর্য্যবতী ১৫।২০ বৎসরের হিন্দু মেয়েরা তৈরী করিত। টাকুতে স্থতা কাটা হইত। আবহাওয়া বুঝিয়া বৃদ্ধারা পাড়ার কাটুনিদের ডাকিতেন। প্রাতে স্নান করিয়া স্থতা কাটা আরম্ভ হইত, আবহাওয়া পরিবর্ত্তন হইলে স্থতা কাটা বন্ধ হইত। স্থতা কাটার পর, মাড় দেওয়া, তানা দেওয়া, সানে ভর্ত্তি করা, তাঁতে যুৎ করাও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিত। একখানি মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে এক বৎসর সময় লাগিত। মস্‌লিনের নানা শ্রেণী আছে, যেমন সাঙ্গাতি, শরবতি, মলমলখাস, কাশিদা, নয়ানস্থখ, মেঘডুম্বুর, জামদানী, বদনখাস, প্রভৃতি। কাশিদা মস্‌লিনের উপর রেশমের বুটী তোলা হইত। এখন

বিলাতী সূতার কাশিদা ৮৲ হইতে ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। এককালে ২০০৲ হইতে ১৫০০৲ টাকায় এক একখানা জামদানী বিক্রয় হইত। ঐ সকল বস্ত্রের সঙ্গে বাফ্‌তা, বুন্‌নি, হাম্মাম, গুলবদন শাড়ীও ঐ সকল স্থানে প্রস্তুত হইত। মুসলমান জোলারা এই সকল অল্প দামের কাপড় প্রস্তুত করিত। মুসলমান বাদশাহগণ মস্‌লিন বস্ত্র-শিল্পীদের নিষ্কর ভূমি ও নগদ অর্থ প্রভৃতি পুরস্কার দিতেন। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা বলিতেন মস্‌লিন নিশ্চয়ই বিদ্যাধরীরা বা পরীরা প্রস্তুত করেন। নুরজাহানের চেষ্টায় মস্‌লিন সম্রাট্ দরবারে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের কন্যা বেগম জেবউন্নিসা ১০ আউন্স ওজনের ২০ হাত দীর্ঘ একখানি মস্‌লিন ৭ ফের করিয়া পরিয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহার বস্ত্রাল্পতা ও নগ্নতা দেখিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঘাসের উপর বিছান শিশির-সিক্ত মস্‌লিন চোখে দেখা যাইত না। একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্রপথে একখানি মস্‌লিন অক্লেশে টানিয়া আনা যাইত। হাতে রাখিলে অনেক সময় কাপড় আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বর্ষে ঢাকায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মস্‌লিন বিক্রীত হইত। একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ মস্‌লিনের মাত্র ৪ তোলা ওজন হইত। এখনও ঢাকা জিলার বাবুর-হাটে প্রতি হাটে হাটে এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকার মস্‌লিন বিক্রয় হয়।

৫। বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পঃ রেশম ও বাকলের কাপড়

রেশমের চাষ বাঙ্গালার নিজস্ব। অর্থশাস্ত্রে আছে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ইহার বহুল চাষ হইত। রেশমের কাপড়ের নাম ছিল "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া পশম বাহির করে। এই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে (কর্ণ-সুবর্ণ)। নাগকেশর, বকুল, বট, মাদার প্রভৃতি গাছে এই পোকা জন্মিত।

চীনদেশের রেশম তুঁত গাছ হইতে হইত। ইহা হইতে বোঝা যায় বাঙ্গালার রেশম, চীনের রেশম হইতে বিভিন্ন ছিল। চীনের রেশম ছিল সাদা, বাঙ্গালার রেশমের রঙ বিভিন্ন গাছের পাতার রঙের জন্য বিভিন্ন রকম হইত।

আদিম মানব পাতা পরিত। পরে বাকল পরিত—গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত। সাঁচী পাহাড়ের উপরস্থ স্তূপে বাকল-পরা অনেক মুনি-ঋষির চিত্র আছে। বাকলের পর শণ, পাট, ধঞ্চে হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনিত। এই কাপড়ের নাম ছিল "ক্ষৌম" বা "দুকুল"। ক্ষৌম পবিত্র বস্ত্র হিসাবে লোকে আদর করিত। একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন এক জোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করিলে ৫৭৬০টী কীটের মৃত্যুর কারণ হইতে হয়। "বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করিলে ততোধিক পাপের সম্ভাবনা।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে বাঙ্গালীর "দুকুল" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিল—ইহার রঙ শ্বেত ও স্নিগ্ধ হইত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। পরবর্ত্তী-কালে এই বাঙ্গালা দেশই মস্‌লিন প্রস্তুত করিয়াছিল।

৬। বাঙ্গালীর বাণিজ্য

বাঙ্গালীর "নৌশিল্প" ও "উপনিবেশ" পরিচ্ছেদদ্বয়ে বাঙ্গালার বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পণ্য সামগ্রী গৌড় ও তাম্রলিপ্তি হইতে রপ্তানি হইত সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। ঢাকার মস্‌লিনের চাহিদা রোম, চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে ছিল। মুসলমান যুগে বহির্ব্বাণিজ্য একাধিক কারণে লোপ পায়। ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প অল্পে অল্পে ম্যাঞ্চেস্‌টার প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি এখনও বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে তাঁতের বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানকার বহির্ব্বাণিজ্যে কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানির

প্রাচুর্য্য দেখা যায়। পাট, চাউল, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি আমাদের প্রধান রপ্তানির দ্রব্য। আমাদের আমদানীর মধ্যে শিল্প দ্রব্য—যথা, কাপড় ও অন্যান্য বস্ত্র, কাঁচ ও এনামেলের বাসন প্রভৃতিই প্রধান। আমরা যে পাট জন্মাইতাম তাহারই মূল্য ছিল ১০০ কোটী টাকা। বর্ত্তমানে মূল্য হ্রাস হওয়ায় ৩০।৪০ কোটী টাকার বেশী মূল্য আমরা পাই না। দুঃখের বিষয় সমগ্র পাটের ব্যবসা অবাঙ্গালীর হস্তে। ফলে বাঙ্গালার এত অর্থকষ্ট।

৭। বাঙ্গালার কীর্ত্তন সংগীত

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—যথা, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটী ও বাঙ্গালী সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তিন প্রকার রীতির গান প্রধান—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা। ঠুংরী, গজল, খেমটা প্রভৃতি টপ্পার অন্তর্গত।

বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালীর গান—কীর্ত্তন। রাগ-রাগিনীযুক্ত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী বাঙ্গালা গান নহে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে অনেক রাগ-রাগিণী, তাল, মান বাঙ্গালীর কীর্ত্তনে গৃহীত হইয়াছে। সুর ও তালের দিক হইতে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা সঙ্গীতে সামঞ্জস্য থাকিলেও কথা ও সুরে বাঙ্গালার কীর্ত্তনের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্যই কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। এই কীর্ত্তন বৌদ্ধাচার্য্যগণ (লুইপাদ প্রভৃতি) কর্ত্তৃক হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হয়। "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইত। চীনের কাই-ফেং নগরের বিখ্যাত লৌহমন্দিরে (উহা ৯০০ হইতে ১২৮০ খৃঃ মধ্যে নির্ম্মিত) একটি কীর্ত্তনের চিত্র অঙ্কিত আছে। কোঁচা দিয়া কাপড় পরা, কোমরে চাদর বাঁধা, মাথায় ঝুঁটি কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন চলিয়াছে। চিত্রটি বাঙ্গালার কীর্ত্তনীয়ার অপরূপ চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় বাঙ্গালীর কীর্ত্তন কত পুরাতন।

বর্ত্তমান কীর্ত্তনের পাঁচটি স্কুল বা ঘর আছে—যথা, (১) গড়েরহাটী, (২) মনোহরসাহী, (৩) রেণেটী, (৪) মন্দারিণী, (৫) ঝাড়খণ্ডী। ঝাড়খণ্ডী বহুদিনই লোপ পাইয়াছে।

রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণার খেতুরীতে যে কীর্ত্তন পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হয় তাহাকে গড়েরহাটী বলে। গরাণহাটী শব্দটি ভুলক্রমে ব্যবহৃত হয়। নরোত্তম ঠাকুর এই পদ্ধতি প্রচলন করেন। ইহাতে ১০৮ তাল ব্যবহার হয়। বৃন্দাবনে এই পদ্ধতির বিশেষ আদর। বাঙ্গালায় এই ঘরের লুপ্তোদ্ধার করিয়াছেন "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ।"

মনোহরসাহী রাঢ়ের অন্তর্গত। সেইখানে রাঢ়ের প্রাচীন কীর্ত্তন পদ্ধতি সুসংস্কৃত হয়। সেজন্য রাঢ়ের নাম মনোহরসাহী হইয়াছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ কীর্ত্তন গায়কই এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ৫৪টী তাল ব্যবহার হয়। রেণেটী পদ্ধতির উদ্ভব হয় বর্দ্ধমান জেলায়। ইহা এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। সরকার-মন্দারণে মন্দারিণী পদ্ধতির উৎপত্তি। উহাতে ৮টী তাল ব্যবহার হয়। উহাও লুপ্তপ্রায়।

ধ্রুপদের সহিত গড়েরহাটী গানের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। ধ্রুপদের প্রধান প্রধান তালগুলি যথা, চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল, ঢিমা-তেতাল, ঝাঁপতাল, রূপক প্রভৃতি মৃদঙ্গে ব্যবহার হয়। ধ্রুপদের চারিটি রীতি প্রচলিত ছিল,— যথা, গওহাড়বাণী, নওহড়বাণী, ডাগরবাণী ও খাণ্ডারবাণী। ইহা হিন্দী শব্দ— অর্থও কেহ জানে না। কেহ কেহ বলেন গৌড়ীয় হইতে গওহাড় হইয়াছে। এই জন্যই কি ধ্রুপদের সহিত গড়েরহাটীর এত সাদৃশ্য ? খেয়াল ও মনোহর-সাহী কীর্ত্তনে সাদৃশ্য খুব বেশী। খেয়ালে যে সকল তাল ব্যবহৃত হয়, মনোহর-সাহীতেও সেই সেই তাল ব্যবহৃত হয়। টপ্পা রেণেটী কীর্ত্তনের লক্ষণযুক্ত।

বাঙ্গালার প্রাচীন থিয়েটারের ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছেদে "অমর-জীবনী"র অন্তর্গত নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের জীবনী মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

৮। ভারতীয় ও বঙ্গীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

ঋকমন্ত্র গীত হইত। সামবেদ ঋক হইতেই উৎপন্ন। সেইজন্য কেহ কেহ সামবেদকেই সঙ্গীতের আদিগ্রন্থ বলেন। সামগানে সপ্তস্বর ব্যবহৃত হইত। ভরতমুনি সর্ব্বপ্রথম 'নাট্যশাস্ত্র' নামে সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন। "সঙ্গীত-মকরন্দ" নামে নারদকৃত একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে লিখিত। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' জগৎ বিখ্যাত। তিনি প্রত্যেক গানটিতেই তাল ও রাগিণী সন্নিবেশ করেন। সেগুলি কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গধর "সঙ্গীত-রত্নাকর" প্রণয়ন করেন। মুসলমান যুগে (১২০০-১৮০০) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নবজীবন লাভ করে। গোপাল নায়ক, বৈজু, হরিদাস স্বামী, গওসের আলী, তানসেন প্রভৃতি এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। ইংরাজ যুগেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা অপ্রতিহত গতিতে চলে। বাঙ্গালীও এ বিষয়ে প্রধান পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ৺রাধামোহন সেন, ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার তথা ভারতের বরেণ্য কবি গীতাঞ্জলি-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের নাম না করিলে আধুনিক যুগের সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

৯। বাঙ্গালার পল্লীগীতি

বাঙ্গালা পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলি দুই তিনশত বর্ষাধিক কাল হইতে প্রচলিত আছে। কোন কোনগুলি বহু প্রাচীন, অনুমান করা যায় যে ১০ শতাব্দীর কাছাকাছি সেগুলি এক সময়ে রচিত হইয়াছিল। মনসা

দেবীর ভাসান, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া কোনগুলি ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, কোনগুলি বা সামাজিক রীতিনীতিদ্যোতক, কতকগুলি বা রাজ-রাজড়ার স্তুতিবাচক, (যেমন—দেবপাল, মহীপাল, রামপাল সম্বন্ধীয় গীতিকা) এবং অনেকগুলিই মানবীয় প্রেম সম্বন্ধীয়। প্রায় প্রত্যেকটির মুখবন্ধে শিবের বন্দনা আছে। এইজন্যই আমাদের দেশে প্রচলিত কথায় বলে "ধান ভান্‌তেও শিবের গীত।" শিবের আরাধনা এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পল্লীগীতি পালা বাঁধিয়া গীত হয়। আমাদের দেশের পল্লীগীতি রচয়িতাদের কবিত্বশক্তি কিরূপ গভীর, বাস্তব ও প্রাণপূর্ণ তাহা এই সকল গীতের প্রতি ছত্রে সুস্পষ্ট। সামাজিক নিয়ম নিগড়ে বা সংস্কারের বাঁধনে তাহারা ধরা দেয় না। যৌবন-বিবাহ, স্বেচ্ছা-বিবাহ, স্বামী নির্ব্বাচন, এমন কি ব্যাভিচারী প্রেমকেও তাহারা সমর্থন করে। কিন্তু অনাবিল কবিত্ব ও স্বচ্ছ প্রাণস্পর্শী ভাবধারা উহাদের বৈশিষ্ট্য। ফরাসী লেখক রোঁমা রোঁলা বলেন, "ইহাদের সরলতা ও ভাবের গভীরতা আশ্চর্য্যজনক, কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক, এই নিরক্ষর কবিদের অসামান্য শিল্পদক্ষতা।" রোটেনষ্টাইন বলিয়াছেন, "এই পালা গানের অপূর্ব্ব নারী-চরিত্রগুলি অজন্তার নারী-চিত্রের প্রতিরূপ, ইহারা তাহাদেরই জাতি।" আমেরিকান মনীষী এলেন বলেন, "এই সকল গীতিকায় দেখা যায় যে, ভারতের লোক তাহাদের যৌবনের অফুরন্ত বীর্য্য এখনও হারায় নাই।" ম্যাডাম হগ্‌মান বলেন, "ইহাদের নারী-চরিত্রগুলি সেক্সপীয়ারের নারীচরিত্র-গুলির সহিত তুলনীয়।"

১০। বাঙ্গালার চিত্রকলা

বাৎস্যায়নের মতে সমস্ত কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেয়ালের গায়ের ছবি (প্রায় লুপ্ত), ও অন্য

প্রকারের খাঁটী বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতির মধ্যে প্রধান—পশ্চিম বঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ব্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, সরায় আঁকা ছবি (এখন প্রায় লুপ্ত), ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা—এইগুলি আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে।"

বৈষ্ণব যুগে যেমন বাঙ্গালায় কীর্ত্তন সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব হয়, চিত্রকলা-জগতেও সেইরূপ যুগান্তর আসিয়াছিল। বৈষ্ণব যুগের চিত্রাবলী বেশ উচ্চাঙ্গের এবং উহাতে প্রাচীন ভারতীয় কলার অনুশীলন দেখা যায়।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "কলাবিদ্যার মধ্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল। "ভেলুয়া" নামক পল্লীগীতিতে বর্ণিত বণিকরাজ মুরাইএর বাড়ীর সহিত ফরিদপুরের একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর হুবহু মিল দেখিয়াছি। অজন্তা গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-পাতার পরম ঐক্য দেখিয়া মনে হয় সেই গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব শিল্পী ও কর্ম্মিগণের বংশধরগণ অবস্থার নিদারুণ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও তাঁহাদের কারুকার্য্যের পূর্ব্বসংস্কার ভুলিয়া যান নাই।"

প্রথিতনামা চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদারও **অজন্তার চিত্রকলা** দর্শনে মন্তব্য করিয়াছেন,—"আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাংলা দেশের দৃশ্যের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিরই মাটির ছাদ; কিন্তু অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার মত খড়ে ছাওয়া আটচালা। ওদেশের লোক নারকোল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকোল গাছ যথেষ্ট। বঙ্গদেশের ষাঁড়ের দেহের তুলনায় তার স্কন্ধটাই যেমন বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশের সে রকম দেখা যায় না। অজন্তার ১নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র

দেখা যায় অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গাপ্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজন্তার নিয়মে গোবরমাটির জমির উপর সাদা রং দিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজন্তার শিল্পীদের রেখার টানের কথা সহজে মনে পড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথায় বল্‌তে ইচ্ছে হয়—

"আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়,
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অজন্তার এই ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ফার্গুসন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই ছবিগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের চিত্র অজন্তায় ১৭নং গুহায় অঙ্কিত আছে। ঐ চিত্রমধ্যে ঢোল ও মন্দিরা লইয়া বাঙ্গালাদেশের মত সংকীর্ত্তনের উদ্দাম নৃত্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের পটুয়াদের অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পট রাজপুত চিত্র-শিল্পের আদর্শ বলিয়া কথিত হয়। মোগল চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অল্পস্থান মধ্যে সূক্ষ্ম ও ঘন সন্নিবিষ্ট চিত্রাঙ্কন, বাঙ্গালা চিত্রকলার বৈশিষ্ট হচ্ছে দীর্ঘ দীর্ঘ রেখাপাত দ্বারা ভাব প্রকাশ করা।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশ ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধার করিয়া সমগ্র ভারতে এবং পাশ্চাত্যদেশেও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি এই পথের প্রদর্শক।

১১। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা

চরক ও সুশ্রুত উভয়েই আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যাহা দ্বারা আয়ু পাওয়া যায় বা যাহাতে আয়ুর বিচার আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। সুশ্রুত অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ছিলেন, চরক কায়চিকিৎসা বিচক্ষণ ছিলেন। চরক ও সুশ্রুত কিন্তু এক-মতাবলম্বী ছিলেন না। চরককে যদি আত্রেয় সম্প্রদায় বলা যায় তবে সুশ্রুতকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসানৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় পাই যে তিনি বিস্পলার একটি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হইলে তাহার বদলে একটি লোহার পা জুড়িয়া দেন; আন্ধ্য ও কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করেন; বামদেবকে মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসব করান ও বন্ধ্যানারীদিগকে সুপ্রজা করিতে পারিতেন। অশ্বিনীকুমার "চিকিৎসা-সার" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর কাশ্যপ তাঁহার তন্ত্র লেখেন। সুশ্রুতের শস্ত্রচিকিৎসা অন্ততঃ খ্রীঃ পূর্ব্ব হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার সময়ে শব-ব্যবচ্ছেদ ত হইতই, অধিকন্তু উদরমধ্যে শস্ত্রোপচার করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করা হইত। তিনি চক্ষুর ছানি কাটিবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন সম্ভবতঃ তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। মশক হইতে জ্বরের উৎপত্তি ও জীবাণু হইতে রোগের উৎপত্তি প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত ছিল।

তাহার পর জীবকের পরিচয়। তিনি আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজগৃহের একটি ধনীর স্ত্রীর উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে যে অন্ত্রগুলি পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করিয়া পুনরায় অন্ত্রতন্ত্রকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন। সুশ্রুত ১২০টী শস্ত্রযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রোগীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত সেকালেও ফিল্টার, বেডপ্যান প্রভৃতির প্রভূত ব্যবহার ছিল। ভারতে শস্ত্রচিকিৎসার অবনতি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় যে আকাশগোত্ত একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভগন্দরে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া

উহার একটি বিরাট মুখ সৃষ্টি করিলে, বুদ্ধদেব তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বীভৎস ভাবে আবিষ্ট হন এবং মনুষ্যদেহে এরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন। সেই হইতে অস্ত্রচিকিৎসার এতদূর অবনতি হইয়াছিল যে শঙ্করাচার্য্য ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইলে উহা অচিকিৎস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। খৃঃ ৮ম ও ৯ম শতাব্দী মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা লোপ পায়।

চরকসংহিতা পড়িলে মনে হয় যেন এই পুস্তকখানি কোনও ভিষকসমিতির বক্তৃতাগুলির সার সঙ্কলন। দৃঢ়বল নামক কাশ্মীরী ভিষগ চরকের শেষ ১৭টি অধ্যায় লিখিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। চরক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। তারপর বাগ্‌ভটের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মগধ-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

নিখিল বঙ্গীয় তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নাটোর রাজবৈদ্য শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন তাঁহার অভিভাষণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বাঙ্গালার দান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলেও সপ্তম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। মাধবকরের নিদান ভারতবিখ্যাত গ্রন্থ। আজিও আয়ুর্ব্বেদ-সমাজে তাহার আদর সমভাবেই চলিতেছে। উহা আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া মৌলিকত্বের পরিচয় দিতেছে। চক্রপাণি দত্ত একাদশ শতাব্দীতে যে শ্রেষ্ঠতম ভিষক্ ছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি রসৌষধকে আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদে নবযুগ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধারাই আজ চিকিৎসাবিজ্ঞান জগতের আদর্শস্থানীয়। পৃথিবীর সকল জাতি এই আদর্শ তাঁহাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৃত চরকের টীকা আজও পৃথিবীর অন্যতম সম্পদ্। মুসলমান রাজত্বকালে শিবদাস সেনও চক্রদত্তের টীকা লিখিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও ৺গঙ্গাধর রায় কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাঁহার অভিনব দান দ্বারা আয়ুর্ব্বেদে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায়

বিজয়রত্ন সেন, বিরজাচরণ, প্রাণাচার্য্য হারাণচন্দ্র, বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেকেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতব্যতীত মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ, ৺রমানাথ, ৺গঙ্গাধর, ৺পঞ্চানন, ৺বিশ্বনাথ, ৺কৈলাস, ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ, কবিরাজ শিরোমণি ৺শ্যামাদাস, ৺যামিনীভূষণ, নাটোরের ৺ঈশ্বরচন্দ্র, বহরমপুরের ৺গোবিন্দসেন, ৺শীতলচন্দ্র প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বঙ্গীয় কবিরাজ তাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে ভারতবিশ্রুত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদকে জনসাধারণ মধ্যে প্রচার করিয়া ৺বিনোদলাল সেন, ৺অমৃতলাল গুপ্ত, ৺নগেন্দ্র সেন, ৺উপেন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মথুরামোহন প্রমুখ কবিরাজগণ আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

বাঙ্গালী মাধবকর ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক। আশ্চর্য্যের বিষয় চরক ও মাধবের মধ্যে ৬০০ বৎসরের ব্যবধান হইলেও ইহার মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ভিষকের নাম পাওয়া যায় না। চক্রপাণি দত্ত একাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি গৌড়দেশীয় ছিলেন ও নয়পালদেবের রন্ধনশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুশ্রুতের উপর ভানুমতী নামক টীকা প্রণয়ন করেন। চরকের উপরও তাঁহার টীকা আছে। অরুণ দত্ত ও বিজয় রক্ষিত উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। রক্ষিতের টীকা হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বে বহু বাঙ্গালী চরকের উপর টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গোমিন্ জিনদাস, গদাধর, কল্পচন্দ্র, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছেন, এবং স্বামিকুমার, হরিশ্চন্দ্র, শিবদাস সেন, কল্পচন্দ্র, ঈশ্বরসেন, বকুলকর, জিনদাস, গোবর্দ্ধন, সন্ধ্যাকর, জয়নন্দী, নরদাস প্রভৃতি চরকের টীকা লিখিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত কৃত নিদানের অসমাপ্ত টীকা তাঁহার ছাত্র শ্রীকণ্ঠ দত্ত সমাপন করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শার্ঙ্গধরের গ্রন্থখানি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকা ও বঙ্গসেনের গ্রন্থখানি কবিরাজ সমাজে সমাদৃত। একাদশ শতাব্দীতে নাড়িচক্রাভিজ্ঞ বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সম্ভবতঃ নাড়ী পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। চরক ও সুশ্রুতে নাড়ী পরীক্ষার উল্লেখ নাই।

মুসলমান আমলে হকিমি চিকিৎসা প্রসার লাভ করে। ইংরাজ আমলে সর্ব্বপ্রথমেই সম্রাট্‌গণের অন্তঃপুরে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার আদর হয়। ইহা অচিরে অভূতপূর্ব্ব প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলন আরম্ভ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আয়ুর্ব্বেদ আবার প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় চারিটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্‌টী স্থাপিত হইয়াছে (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের নাম দ্রষ্টব্য)।

এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার আদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ব্যতীত এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য কয়েকটি জেলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকটি হোমিওপ্যাথি স্কুল ও কলেজ থাকিলেও উহাদিগের সরকারী পরিচয় না থাকায় সেগুলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবার পথে বাধা জন্মাইতেছে। সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি ফ্যাকাল্‌টী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১২। গো-অশ্ব-হস্তী-চিকিৎসা বিদ্যা

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—"আর্য্যরা প্রথমে হস্তী দেখেন নাই। বঙ্গদেশই হাতীকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। একদা রাজা দশরথের জামাতা অঙ্গরাজ লোমপাদের হাতী চড়িবার সখ হইলে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। তাহারা অবশেষে বহুদূরের এক ঋষির আশ্রমের সংবাদ আনিল। ঐ ঋষি হাতীর দল রক্ষা করেন। তাঁহার নাম পালকাপ্য। লোমপাদ তাঁহার নিকট হস্তীবশ ও পালন শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। কাপ্যগোত্র এক বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। পালকাপ্য "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" প্রণয়ন

করেন। এই গ্রন্থখানিতে ১৬৪টি অধ্যায় আছে। তিনি খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়।" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন "ধন্বন্তরির নিকট সুশ্রুত (গান্ধার দেশীয়) গজবিদ্যা ও গো চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই ধন্বন্তরি ও পালকাপ্য একই ব্যক্তি ছিলেন।" তাহা হইলে দেখা যায় ধন্বন্তরি বাঙ্গালী ছিলেন।

১৩। বিজ্ঞান আলোচনা

রস শাস্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত। বঙ্গ-মগধবাসী নাগার্জ্জুন রস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "রসার্ণব" ও "রসরত্নসমুচ্চয়" গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রাচীনকালে কিরূপে ধাতুশুদ্ধি ও স্খলন হইত তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। সুবর্ণ, টিন, রজত, তাম্র, সীসা, লৌহ, আর্সেনিক, এ্যান্টিমণি প্রভৃতির ব্যবহার চরকে উল্লেখ আছে। সুশ্রুত আয়রণ পাইরাইট্স্ ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্ষার, শীলাজতু, পারদ প্রভৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। সপ্তম শতকে বৃন্দের গ্রন্থে পর্পটি তাম্রের উল্লেখ পাই। বাগ্ভটের মধ্যেও পারদ ও সীসকের রসাঞ্জন দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী দেখা যায়। চক্রপাণির পুস্তকে (১১শ শতাব্দী) পারদ ও গন্ধক দ্বারা কজ্জলী বা পর্পটির প্রণয়নের ব্যবস্থা দেখা যায়।

ইংরাজ যুগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞান-আলোচনা প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞানাগার, সায়েন্স কলেজ, বসুবিজ্ঞান-মন্দির, বহুবাজার বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি কলিকাতায় বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রস্থল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় বিজ্ঞান সাধনার পথ প্রদর্শক হইতেছেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ সালে তিনি বহুবাজারে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রয়োগ-শালা (Laboratory) ভিন্ন কোন বিজ্ঞানাগার ছিল না।

অঙ্ক শাস্ত্রে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "ডিফারেন্সিয়াল

ইকোয়েশন” সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান সর্ব্বজন স্বীকৃত। তিনি “মারকিউরাস্ নাইট্রাইটের” অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই বিভাগে ডাঃ জে, সি, ঘোষ; ডাঃ জে, এন্, মুখার্জ্জী (ইলেকট্রো কেমিষ্ট্রি অফ্ কলয়েডস্); এইচ্, কে, সেন; পি, আর, রায়; জে, এন, রায়; বি, বি, দে প্রভৃতির গবেষণা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যায় মহেন্‌জো-দারো ও হরপ্পার আবিষ্কর্ত্তা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চে। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন পাটলীপুত্রের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এন্, জি, মজুমদারের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশ একটি সুসন্তান হারাইয়াছে। য্যানথ্রোপোলজীতে ডাঃ গুহ ও চাক্‌লাদার মহাশয় যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। পদার্থ বিদ্যায় ডাঃ রমেণের দান অতুল। “Raman Effect” জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে এবং ডাঃ রমণ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। মাত্র ৭৫৲ টাকা মাহিনার কেরাণীর পদ হইতে উদ্ধার করিয়া সার আশুতোষ ডাঃ রমণকে আজ জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহাও বহু বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার “Stellar Spectra” সম্বন্ধে গবেষণা বিশেষ আদর পাইয়াছে, তাঁহার “Saha's Equation” বিজ্ঞানজগতের অমূল্য সম্পদ। এই বিভাগে ডাঃ পি, এন্, ঘোষ; এস্, এন্, বসু; এস্, কে, মিত্র; ডি, এন, বসু প্রভৃতির গবেষণা ফলপ্রদ হইয়াছে। শিশিরকুমারের রেডিও গবেষণা, ডি, এম্, বসুর চুম্বকের উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনব মতবাদ, এবং সত্যেন্দ্র বসুর “Statistics of Photons” বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সার জগদীশচন্দ্রের দান অতুল। তিনি বেতারে সংবাদ প্রেরণ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা করেন। চিকিৎসা বিভাগে ডাঃ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমর বাঙ্গালী

ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী—জৈনরা ২৪ জন তীর্থঙ্কর ও ছয়জন শ্রুতকেবলী পূজা করিয়া থাকেন। যিনি শ্রুতপারগ ও যোগপ্রধান ও ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহাকে শ্রুতকেবলী বলে। ভদ্রবাহু জৈনদের ষষ্ঠ শ্রুতকেবলী। পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই কোটিকপুর নগরে ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সোমশর্ম্মা রাজপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল সোমশ্রী। এই কোটিকপুর ক্রমে কোটীবর্ষ এবং পরে দেবকোট আখ্যা পায়। ইহা দিনাজপুর সহর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

একবার মহামুনি গোবর্দ্ধন শ্রুতকেবলী, চারিজন শ্রুতকেবলী সহিত কোটিকপুরে জম্বুস্বামীর সমাধি দর্শন করিতে আসেন। সেখানে বালক ভদ্রবাহুর শুভচিহ্ন দেখিয়া গোবর্দ্ধনস্বামী তাঁহার পিতামাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। মুনিবরের তত্ত্বাবধানে তিনি জৈন বেদ ও চতুর্দ্দশ বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন। পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আচার্য্য মধ্যে পরিগণিত হন। তিনি দশখানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করেন। মুনিরত্ন সূরি তাঁর এই দশ নির্য্যুক্তিকে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। একদা ভদ্রবাহুস্বামী পাটলিপুত্র নগরে আগমন করিলে মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ভদ্রবাহুস্বামী জ্ঞানযোগে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা জানিতে পারেন। "সেই মহামারী সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে শস্যাদি

হইবে না, বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহাদের ধর্ম্মও কলুষিত হইবে"। সে কারণ তিনি তাঁহার দ্বাদশ সহস্র শিষ্য ও অন্যান্য লোকসহ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু-সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিশাখ মুনিকে সদলে চোর-মণ্ডলে প্রস্থান করিয়া দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। সকল শিষ্য চলিয়া গেলে মাত্র চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। তৎপরে ভদ্রবাহুস্বামী কোটবপ্র নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অন্তিম ধ্যানে নিমগ্ন হন এবং সপ্ত শত ঋষির অভীষ্ট পদ লাভ করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া গুরুর পাদপদ্ম পূজায় নিরত হন। এই কোটবপ্র পর্ব্বত চন্দ্রগুপ্তের নাম হইতে চন্দ্রগিরি আখ্যা পায়। ইহা দক্ষিণ ভারতের মধ্যে জৈনদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভদ্রবাহুস্বামী ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। দুঃখের বিষয় যে যুগে এরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেকালের ও সেকালের-বাঙ্গালীর আমরা অতি অল্প সংবাদই জ্ঞাত আছি।

বিজয়সিংহ—বুদ্ধদেবের আগে বঙ্গদেশে বঙ্গ নগরে এক রাজার একটি সুশ্রী কন্যা জন্মে। যৌবনে সে কন্যা মগধযাত্রী এক বণিকের দলে মিশিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে বঙ্গদেশের সীমানাস্থিত কোন সিংহ উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাঁহার সিংহবাহু নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র বড় হইলে মাতাকে লইয়া মাতামহ ভবনে উপস্থিত হয়। এই সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিজয়। বিজয় বড় হইয়া অত্যন্ত দুরন্ত ও অত্যাচারী হয়, সেকারণ প্রজাবৃন্দ তাহার পিতার নিকট তাহাকে বধ করিবার প্রস্তাব করে। রাজা ৭০০ অনুচরসহ তাহাকে একটি নৌকা (জাহাজ) করিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য তিনি আর একখানি নৌকা দেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানি নৌকা দেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে বোম্বাইএর নিকট সুপ্পরা (বর্ত্তমান সুপারা)

নগরে উপস্থিত হন। সেখানে অত্যাচার আরম্ভ করিলে, লোকে তাড়া করে, তখন তিনি লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। সেইদিনই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। বিজয় লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া সেখানে রাজা হন এবং দেশের নাম নিজ নামানুসারে সিংহল রাখেন। ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অজন্তার গিরিগুহায় বিজয়সিংহের লঙ্কা-জয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

পালকাপ্য ঋষি বা ধন্বন্তরি—দশম অধ্যায়ে হস্তি-অশ্ব-গো চিকিৎসা-বিশারদ পালকাপ্য ঋষি বা ধন্বন্তরি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

পাণিনি—এদেশে দশখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম লেখা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাণিনির পুস্তকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লিখিত অনেকগুলি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ প্রচারিত হইলে সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। পাণিনি ৮টি অধ্যায়ে ৪০০০ সূত্রে ব্যাকরণখানি লিখিয়াছেন। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য সূত্রগুলি খুব ছোট ছোট করিয়া লেখেন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পূর্ব্ব চারি শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জানা যায় না, মাতার নাম ছিল দাক্ষী। গান্ধার দেশের শালাতুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। তিনি বাল্যে জড়বুদ্ধি ছিলেন। **রাজা নন্দের সময়ে পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামক এক শিক্ষকের কাছে তিনি অধ্যয়ন করিতে আসেন।** কাত্যায়ন (বররুচি), ব্যাড়ি, চন্দ্রদত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। **তাঁহারই একটি সূত্রে আমরা গৌড়ের প্রথম উল্লেখ পাই।** পাণিনি নামে একজন কবিও ছিলেন। বাঙ্গালী শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' (১২০৫ খ্রীঃ) নামক সংগ্রহ গ্রন্থে কবি পাণিনির কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়।

পাণিনি সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর শিক্ষণীয় কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পাণিনির ব্যাকরণ লিখিবার বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। একদিন তিনি এক

জ্যোতিষীকে তাঁহার হাত দেখান। কিন্তু জ্যোতিষী বলেন ব্যাকরণে, কখনও তাঁহার ব্যুৎপত্তি হইবে না। তখন তিনি একখানি ধারাল অস্ত্র দ্বারা যেরূপ রেখা হাতে থাকিলে ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য জন্মে সেইরূপ রেখা হাতে সৃষ্টি করেন। তারপর যেখানে যত ব্যাকরণ পাওয়া যায় সংগ্রহ করিয়া তাহা তপস্যা করিবার মত করিয়া পাঠ করেন। পরে ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদে এমন একখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন যাহা আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও বঙ্গ-মগধে আসিয়া তাঁহার প্রতিভার স্ফূরণ হয় বলিয়া বাঙ্গালার অমর জীবনী মধ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল। তাঁহার সময়ে বঙ্গ-মগধ এক রাজ্যভুক্ত ছিল এবং একই গৌরবের অধিকারী ছিল।

মহাকবি কালিদাস—"পৃথিবীর ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে—"আমরা মনে করি শ্লোকে কালিদাস নবদ্বীপ রাজধানীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হন। সঙ্গে সঙ্গে আরও সপ্রমাণ হয়—এই বঙ্গদেশান্তর্গত নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পল্লী বিশেষেই মহাকবির জন্মভূমি ছিল; আর বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত এই বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন।"

কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশের বর্ণনায় অনেক স্থানে এরূপ নিপুণতা দেখা যায় যে কেহ কেহ কালিদাসকে নবদ্বীপ নিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। যাহা হউক ইহা এক প্রকার অবিসংবাদী সত্য যে তিনি বঙ্গ মগধবাসী ছিলেন এবং বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল।

রাজা শশাঙ্ক, দেবপালদেব প্রভৃতি—খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মৌর্য্য বংশ মগধে রাজত্ব করে। মৌর্য্য-বংশ লোপ পাইলে শুঙ্গ, কাণ্ব ও কুশান বংশ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করে। খ্রীষ্টীয়

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসে। সপ্তম শতাব্দীতে মগধে দ্বিতীয় গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ মগধের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। আটশত বর্ষ পরে কর্ণসুবর্ণের রাজা গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক উত্তরাপথে বাঙ্গালীর একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। তিনি থানেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে শূরবংশীয় আদিশূর বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। শূর বংশের পতন হইলে নবম ও দশম শতাব্দীতে বাংলার পাল বংশ মগধে রাজত্ব করে। দেবপালদেব এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। পালযুগ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর একান্ত গৌরবের যুগ। এই যুগে বঙ্গ মগধের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিত-গণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র, জেতারি, দীপঙ্কর প্রভৃতি—শান্তরক্ষিত গৌড়বাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। তিনি নালন্দা বিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। তিব্বত থিস্রঙ্গ দিউস্থান কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বত গমন করেন ও তদ্দেশীয় বনধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত করেন। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব উপাধি দান করে। তিনি তিব্বতীয় লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

আচার্য্য জেতারি বরেন্দ্রভূমবাসী। তাঁহার পিতা গর্ভপাদ পালরাজগণের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি রাজা সনাতনের সভাসদ্ ছিলেন। মহারাজ মহীপাল জেতারিকে পণ্ডিত উপাধি দান করেন। তিনি বিক্রমশীলার অধ্যাপকপদে বৃত হন। তিনি ১০০ খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিনি দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত এক রাজার পুত্র। তিনি ধর্ম্মপালের শিষ্য ছিলেন। একদা এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরুর সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে আসিলে তিনি বিচার করিবার ভার গ্রহণ করেন

এবং ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। মহারাজ ধর্ম্মপাল তাঁহার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম পারিতোষিক দিতে প্রস্তাব করিলে তিনি উত্তর দেন, "ক্ষৌম্যবস্ত্রধারী ভিক্ষুক বিষয় সম্পদ লইয়া কি করিবে ?" শীলভদ্র সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। য়ুয়াং চুয়াং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দীপঙ্কর পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে পিতা কল্যাণশ্রীর ও মাতা প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি দর্শন ও ধর্ম্মনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। ওদণ্ডপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীল রক্ষিত তাঁহাকে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি দান করেন। পরে তিনি বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতে থাকেন। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে স্বর্ণ দ্বীপে (পেগুতে) চন্দ্রকীর্ত্তি নামক প্রখ্যাত-নামা পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে দ্বাদশ বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া বিক্রমশীলায় ফিরিয়া আসেন ও উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ হন। এই সময়েই তিব্বতীয় ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য সে দেশের রাজা নিজ ভ্রাতা বীর্য্যচন্দ্রকে ভারতে পাঠান। বৃদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নেপালের পথে তিব্বতে যান। রাজার প্রেরিত শ্বেতছত্র ও নিশানধারী এক শত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিত অশ্বারোহী তাঁহাকে "ওঁ মনিপদ্মে হুম" এই গান গাহিয়া রাজার নামে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। রাজা চান্-চুব্ নিজে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার অভ্যর্থনার ছবি একটি মঠের গাত্রে অঙ্কিত আছে। তিনি তিব্বতের ধর্ম্মের আমূল সংস্কার করেন। তিব্বতীয়েরা আজও তাঁহার নামে প্রণত হয় এবং দেবতা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করে। রাজা তাঁহাকে 'অতীশ' (শ্রেষ্ঠ) উপাধি দান করেন। লাসার নিকটবর্ত্তী ন্যেয়ঙ নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি মন্দিরের নাম "সেগ্রোম"। তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধাচার্য্য সরোরুহবজ্র, ভূসুকু কৃষ্ণাচার্য্য, লুইপাদ—ইঁহারা ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের অন্যতম। বঙ্গীয় তন্ত্রযুগের ইঁহারা প্রবর্ত্তক। বৌদ্ধীয় মহাযান মতের ইঁহারা উপাসক ছিলেন। সরোরুহবজ্রের লিখিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের "দোঁহাকোষ" বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুস্তক। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০।১১।১২ শতকে এই প্রকারের বই লেখা হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় লিখিত কোন পুস্তক পাওয়া যায় নাই। এই সকল পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং তিব্বতীয় তেঙ্গুর হইতে গ্রন্থকারের নাম, বাসভূমি প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ভূসুকুর অন্য নাম শান্তিদেব। তিনি 'বোধিচর্য্যাবতার', 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'সূত্র-সমুচ্চয়' নামক তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি তন্ত্রের একখানি ভাল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্য্যের "দোঁহাকোষ" নামে একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। দোঁহাগুলি (বা চর্য্যাপদ) সঙ্কীর্ত্তনের আকারে লিখিত হইত। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই দোঁহাগুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল, তখন সহজিয়া মতে সংস্কৃতে টীকা করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণাচার্য্য এককালে বাঙ্গালা অঞ্চলের একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইতি সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন।

লুইপাদ দীপঙ্করের সমসাময়িক। তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। তিনি সহজিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। রাঢ় দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। আজও ধর্ম্মঠাকুরের নামে বুদ্ধ প্রচ্ছন্নরূপে পূজা পান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা পান। সর্ব্বসমেত চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য্য আছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি ভুটীয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে। এই সকল ভুটিয়া গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস মিলিবে।

নাথপন্থ মৎস্যেন্দ্রনাথ—ইনি নাথপন্থ ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল মচ্ছঘ্ননাথ, অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। তিনি বৌদ্ধ

না হইলেও নেপালী বৌদ্ধদিগের পরম উপাস্য দেবতা হইয়াছেন এবং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। **গোরক্ষনাথ** বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নাথধর্ম্ম অবলম্বন করায় নেপালী বৌদ্ধরা তাঁহার উপর অনাস্থাসম্পন্ন হন।

বাঙ্গালাই গোরক্ষনাথের প্রধান লীলাক্ষেত্র। নাথেরা না হিন্দু, না বৌদ্ধ। শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদ আকারে লেখা। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথদের একটি প্রধান স্থান। ইন্দ্রিয় সেবায় নাথদের কোন আপত্তি নাই। এককালে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়াছিল।

চন্দ্রগোমিন, অভয়করগুপ্ত, বিশ্বেশ্বর শম্ভু—চন্দ্রগোমিন বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী ও বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। সম্ভবতঃ ৪৬৫ হইতে ৫৪৪ খৃঃ মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার লিখিত "চন্দ্র-ব্যাকরণ" কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত ব্যাকরণ মৌলিক না হইলেও উহা পাণিনির ব্যাকরণের সুবোধ্য, সুবিন্যস্ত ও উন্নত সংস্করণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তিনি ন্যায়ের পুস্তক ও সংস্কৃত স্তোত্র প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারে আচার্য্য স্থিরমতির নিকট তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

অভয়করগুপ্ত বাঙ্গালা দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া উল্লিখিত হন। তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত তাঁহার লিখিত বজ্রযান সম্বন্ধীয় ২০ খানি তন্ত্র পুস্তক পাওয়া যায়। তিনি মহারাজা রামপালের সমসাময়িক। তিব্বতে তিনি লামা হিসাবে পূজিত হন। গৌড়দেশ তাঁহার জন্মস্থান। শেষ বয়সে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় তিনি বহু পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। কথিত আছে যে তাঁহার যাগযজ্ঞের ফলে তুরস্ক সৈন্য দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হয়।

বিশ্বেশ্বর শম্ভু গৌড়দেশস্থ রাঢ়ের অধিবাসী। তিনি নর্ম্মদা তীরস্থ গোলকা

মঠের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। চোল ও মালবের রাজারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তিনি ওয়ারাঙ্গলের কাকটীয় বংশীয় রাজা গণপতির (১২১৩-১২৪৯) দীক্ষাগুরু। তিনি রাজদত্ত সম্পত্তির আয়ে একটি শিব মন্দির, একটি সন্ন্যাসীদের আশ্রম, একটি শিক্ষায়তন, একটি দাতব্য ভোজনালয়, একটি প্রসূতি-আগার ও একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে শতাধিক কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি মাদ্রাজ অন্তর্গত অন্ধ্রদেশে বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বেদচর্চ্চা ঃ পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট, নূগড়াচার্য্য প্রভৃতি—কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র ভবদেবের যে প্রশস্তি লিখিয়াছেন তাহা পড়িলে বুঝা যায় ভবদেব কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। 'সামবেদীয়-পদ্ধতি' ছাড়া তিনি আরও দশ বারখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরাধিপতি হরিবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেব ভট্ট পথ, পুষ্করিণী ও পান্থনিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামলবর্ম্মা বর্ম্মাবংশের পরবর্ত্তী রাজা। ইঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগনের প্রতিপালক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎকালের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই সাগ্নিক ছিলেন না, বেদ চর্চ্চাও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে তখনও বেদচর্চ্চা ছিল। এই পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে আসিয়া বৈদিক নামে পরিচিত হন।

বাঙ্গালীরা "আহম্মুকের মত বেদ মুখস্থ করিত না," যে অংশটুকু কর্ম্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় তাহারা সেইটুকুই পড়িত এবং অর্থ করিয়াই পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গালাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নূগরাচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদ ব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। নূগড়ের পুস্তক এখন পাওয়া না যাইলেও, তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হলায়ুধ, গুণবিষ্ণু প্রভৃতির স্মৃতির সুগম ও সরল ব্যাখ্যাযুক্ত অনেকগুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধগণের সহিত সর্ব্বদা বিচার জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শন-

শাস্ত্রের চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা 'প্রশস্তপাদে'র টীকা এখনও ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ 'স্মৃতিমঞ্জরী' নামে একখানি প্রকাণ্ড স্মৃতি নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। দায়ভাগকার জীমূতবাহন—ভিকন, শ্রীকর, প্রভৃতি বহু স্মৃতি-নিবন্ধকারের, ও জোৎস্নোক অন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি বহু জোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল সেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুইখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও স্মৃতি ও জোতিষের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

চক্রপানি দত্ত—নয়পালদেবের মহান্যাসাধ্যক্ষ নারায়ণ দেবের পুত্র চক্রপাণি দত্ত ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ জগতে সুবিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ 'চক্রদত্ত' প্রণয়ন করেন। দ্রব্যগুণ, সর্ব্বসারসংগ্রহ, চরকটীকা প্রভৃতি ইহার রচিত। ময়ুরেশ্বর গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। তিনি লোধ্রবলী নামক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুশ্রুতের উপর তাঁহার যে টীকা আছে তাহার নাম 'ভানুমতি'। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানু দত্ত নয়পালের ভিষক ছিলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার পুস্তকগুলি আজও আদৃত হয়।

হলায়ুধ, শূলপানি—হলায়ুধের পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম উজ্জ্বলা। তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "মৎসসূক্ত" রচনা করেন। সে সময় গৌড়-বঙ্গ তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন। যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সদাচার রক্ষিত হয়,—তান্ত্রিকতারও প্রতিকূল না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "মৎসসূক্ত" রচনা করেন। তাঁহার রচিত "মীমাংসাসর্ব্বস্ব", "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব", "শৈবসর্ব্বস্ব", "পুরাণসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি পুস্তক আছে। শেষোক্ত পুস্তকে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। তাঁহার অগ্রজ পশুপতি ও ঈশানের স্মৃতি ও মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে।

শূলপাণি এই সময়ের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। পুরুষোত্তমদেব 'ত্রিকাণ্ডশেষ' অভিধান প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব লক্ষ্মণ সেনের

আদেশে "লঘুবৃত্তি" ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ফলে পাণিনির ব্যবহার লোপ পায়। জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় বিরাজ করিতেন। শরণ দুরূহ কবিতা দ্রুত রচনা করিতেন। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য "আর্য্যসপ্তসতী" নামক শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য রচনা করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধোয়ী কবিত্ব শক্তির জন্য কবিক্ষ্মাপতি অর্থাৎ কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। "পবনদূত" নামক কাব্য রচনা করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাব্যখানি কালিদাসের "মেঘদূতের" অনুকরণে লিখিত।

জয়দেব—বাঙ্গালার কান্ত-কবি জয়দেব সমগ্র কাব্য জগতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' জগতের লঘুকাব্য মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সুমধুর পদাবলীর কান্ত-কোমলতানে মুখরিত। উড়িষ্যার মন্দিরে মন্দিরে, বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, প্রতি দেবালয়ের নাট মন্দিরে ভক্তিভরে উহা গীত হয়। তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। বীরভূম জেলায় অজয় নদ তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, মহাসাধক ও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

চণ্ডীদাস—১৪১৪ খ্রীঃ বীরভূমের নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তাঁহার পিতা সম্ভবতঃ গ্রাম্য বিশালাক্ষী দেবীর পুরোহিত ছিলেন। চণ্ডীদাস পিতার ব্যবসা অবলম্বন করেন। রজকিনী রামীর প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু সে প্রেমে দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না; এ প্রেম তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমের রস ধারা বুঝিবার শক্তি দিয়াছিল। গ্রাম্য সমাজ এই প্রেমে বাদী হইল, কিন্তু চণ্ডীদাসকে বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে বাশুলীদেবীর স্বপ্নাদেশে গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসের উপর নির্য্যাতন করিতে বিরত হইল।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কবি-প্রতিভায় পরম আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বাসভবন নান্নুরে আসিয়াছিলেন। মহাকবির শেষ জীবনের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত হয় যে তিনি গৌড়েশ্বরের কোপে পড়িয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু বীরভূম কির্ণাহারের প্রান্তবর্ত্তী বাগডিহী নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে এবং সেখানে এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নাটমন্দির চাপা পড়িয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য ও তান্ত্রিকগণ—বৌদ্ধেরা তাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে বলে তন্ত্র। শৈবরা, নাথপন্থরা, শাক্তরা এমন কি বৈষ্ণবরাও তাহাদের শাস্ত্রগুলিকে তন্ত্র আখ্যা দেয়। তন্ত্র অর্থে যাহাই বুঝাক না, মূলতন্ত্রগুলি হয় হর-পার্ব্বতীর কথোপকথন ছলে লিখিত, নতুবা বুদ্ধদেবের মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত। মূল তন্ত্র অপেক্ষা সংগ্রহই বেশী পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় তন্ত্র সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ আছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মূলতন্ত্রে এমন অনেক প্রক্রিয়া আছে যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহ-কারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ তন্ত্র মার্জ্জিত করিয়া তাহা হিন্দুভাবাপন্ন করা এবং বৌদ্ধগণকে অল্পে অল্পে হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর আনয়ন করা। অতএব সংগ্রহগুলি সম্যক মার্জ্জিত-রুচি না হইলেও, সংগ্রহকারদের উদ্দেশ্য মহৎ থাকায় তাঁহারা সমাজের ধন্যবাদার্হ।

শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু

করিয়া লইয়াছিলেন। তান্ত্রিক ব্রহ্মানন্দ, বুদ্ধের আক্ষোভ্য ও বৈরোচন নাম দুটির প্রথমটিকে লইয়া হিন্দু ঋষি বানাইয়াছেন ও দ্বিতীয়টিকে হিন্দু দেবতার পদ দিয়াছেন। তারাকে হিন্দু দেবী মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দের সংগ্রহ আরও মার্জ্জিত। পূর্ব্ববঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করেন। রাঢ়ে আগমবাগীসের সংগ্রহ আরও বেশী মার্জ্জিত। বৌদ্ধ মঞ্জু-ঘোষকে তিনি হিন্দুর দেবতা করিয়া লইয়াছেন। তান্ত্রিকতা এইভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা ও পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছে।

সাহিত্যেও তাঁহাদের দান অকিঞ্চিৎকর নহে। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গান বাংলার একটি শ্লাঘার জিনিষ। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজি মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গানে বাঙ্গালীর নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠে।

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব—অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত—লোকের অপেক্ষা স্মার্ত্তপঞ্চোপাসকের দলই অধিক। এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গালা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য্য আচারে, আর্য্য বিদ্যায়, ও ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামের মধ্যেও ব্রাহ্মণেরা দেশটাকে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানিতেই পারে নাই, যে তাঁহাদের আগমনের সময় এদেশে হিন্দু ছাড়া আর একটী প্রবল ধর্ম্ম ছিল। মুসলমান যখন প্রাচীন সমাজ (প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ)

ধ্বংস করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, তখন ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত স্মৃতিদর্শন প্রভৃতির দ্বারা হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করা যাইবে না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন বৌদ্ধরা মাতৃভাষায় ছড়া, গান ও কীর্ত্তন করিয়া কিরূপে দেশ মাতাইয়া তুলিত। তাই বৌদ্ধগণের অনুকরণে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিলেন ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। তখন সমাজ তাঁহাদিগের দিকে ফিরিয়া চাহিল। এদিকে মুসলমান সুলতানগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূলতা করিতেছেন মনে করিয়া হিন্দুদের কোল দিলেন। ফলে ব্রাহ্মণদের চেষ্টা দ্রুত ফলবতী হইল।

প্রথম কায়স্থরা ব্রাহ্মণগণকে এ বিষয়ে সাহায্য দানে কুণ্ঠিত ছিলেন, কারণ তাঁহাদের বেশী ঝোঁক ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি। পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, তখন তাঁহারা পুরাণাদি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। গুণরাজ খাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীরাম দাসের আর দুই ভাই, গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ না থাকিলে সংস্কৃত সাহিত্যের নবযুগ আসিত না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্যদেব সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কি না সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত।

কালাপাহাড়—রাজসাহী জেলায় বীরজাওন গ্রামে একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশে কালাচাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ছিল নয়নচাঁদ। তিনি গৌড়ের ফৌজদারী বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। কালাচাঁদ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অস্ত্রচালনার খ্যাতি ও অশ্বারোহণ দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি গৌড়পতির নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইলে, গৌড়পতি তাঁহাকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিয়া গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে নিজালয়ে ফিরিতেন। একদা

তাঁহার বরবপু দর্শনে সুলতান-দুহিতা "দুলারী" তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হন। সুলতান সোলেমান এ সংবাদ পাইয়া কালাচাঁদকে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন। কালাচাঁদ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং ইতিপূর্ব্বেই শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুলতান এ প্রত্যাখ্যানে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। জনপ্রবাদ সুলতানকন্যা বধ্যভূমিতে আসিয়া কালাচাঁদের প্রাণরক্ষা করেন। অবশেষে কালাচাঁদ বাধ্য হইয়া সুলতান কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাজের নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হন। সমাজ-পতিরা তাঁহাকে বলিলেন যে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ লইয়া আসিতে পারিলে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তিনি সমাজে গৃহীত হইবেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যাদেশের আশায় শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সপ্তাহকাল ধন্না দিলেন। হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা ফিরিয়া চাহিলেন না, দেবদাসগণ বিশ্বপতির সিংহদ্বার হইতে ধর্ম্মচ্যুত অবিশ্বাসীকে তাড়াইয়া দিল। ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য কালাচাঁদ হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি মহম্মদ ফরমূলি নাম গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল ধরিয়া তিনি হিন্দুর দেব মন্দির ও বিগ্রহ সকল চূর্ণ করিয়া এবং বলে ও কৌশলে শত সহস্র হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়া কালাপাহাড় আখ্যা প্রাপ্ত হন। কালে তিনি সোলেমান খাঁর সেনাপতি হন। উড়িষ্যাপতি রাজা হরিচন্দন দেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবেন সংবাদ পাইয়া সোলেমান খাঁ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময় তৎকালীন উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দ দেব তাঁহার জনৈক বিদ্রোহী সামন্ত রাজা কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। কালাপাহাড় এই সুযোগে উড়িষ্যা বিধ্বস্ত করেন ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহের লাঞ্ছনা করেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৌড় অধিকারের পঞ্চশত বর্ষ পরে এইরূপে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। সোলেমান খাঁর রাজত্বকালে কোচ

রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি শুক্লধ্বজ গৌড় আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পরাজিত হন। কালাপাহাড় এই সময় কামাখ্যার প্রাচীন মন্দির সমূহ বিনষ্ট করেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর কালাপাহাড় দাউদের সেনাপতি হন।

দাউদ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন শুনিয়া আকবর তোডরমল্লকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দাউদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কটকে আশ্রয় লন ও মোগলের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। আকবর মুণিম খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় গৌড়ে মহামারি হইয়া গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুণিম খাঁও মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাউদ এই সংবাদ শ্রবণে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হন। কিন্তু তিনি রাজমহলের নিকট আকবর সেনাপতি তোডরমল্ল ও হোসেন কুলিখাঁর হস্তে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে কালাপাহাড় নিহত হন। বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের একাধিক ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়ের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনাথ—মুসলমান আক্রমণের পর দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত (ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী) বাঙ্গালী প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতেছিল। এমন সময়ে রাজা গণেশ কয়েক বৎসরের জন্য বাঙ্গালার রাজা হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই শতাব্দীর রুদ্ধ উত্তেজনার স্রোত দেশ প্লাবিত করিল, বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইল। বৃহস্পতি (উপাধি রায় মুকুট) একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন এবং শ্রীকরের সাহায্যে অমর-কোষের একখানি টীকা লিখেন। শ্রীনাথের সমাজ বন্ধনের চেষ্টা বিফল হইলেও, রঘুনন্দন হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজ বন্ধন করিয়া দেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি—বাঙ্গালার নব্য ন্যায়—সংস্কৃত চর্চ্চার সহিত দর্শনশাস্ত্রের—বাঙ্গালার নব্য ন্যায়ের—

চর্চ্চা আরম্ভ হইল। গত চারি শতাব্দীতে বাঙ্গালার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গালা কহিতে পারেন।

নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না, বাঙ্গালা ভাষাও শিখিতে হয়। কাশ্মীর যাও, পাঞ্জাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতনা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহীশূর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারিটি বাঙ্গালা কথা শুনিতে পাইবে। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম, দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। রঘুনাথের তত্বচিন্তামণির টীকা ভারত প্রসিদ্ধ। ইহাদের পর হরিরাম, জগদীশ, গদাধর, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রধান। বিশ্বনাথ তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক, তথাপি ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' চলিতেছে। তাঁহার টীকাকার একজন মারাট্টি, নাম মহাদেব দিনকর * * *। বাঙ্গালার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের চিনিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বাঙ্গালার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না। জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ বলেন বাঙ্গালার নব্য ন্যায় এরূপ সূক্ষ্ম যে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে। বর্ত্তমান যুগে নব্য ন্যায়ে আলোকনাথ, গোলকনাথ, হরিদাস, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকর—বৌদ্ধ ধর্ম্মমতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক, বণিক ও কারিকর। বৌদ্ধ বিহারগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিল। মুসলমানগণ 'বিহার' ধ্বংস করিয়া উহার সম্পত্তি আফ্‌গান সিপাহীগণকে পুরস্কার দিত। ফলে তাহারা সেইখানে বসবাস করিয়া নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধগণকে মুসলমান করিয়া ফেলিত। বাকি যাহারা থাকিত তাহারা হিন্দু হইয়া যাইত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়াছিল দুইদল ব্রাহ্মণ—এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, আর এক দলের নেতা গৌড়ীয়

শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। প্রথম দল বৈষ্ণব, দ্বিতীয় দল শাক্ত। চৈতন্যদেব ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁহার পরিকর ছিলেন বাঙ্গালী—রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পর্য্যন্ত। বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধগণের চর্য্যাপদের অনুকরণে পদাবলীর সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণব পদাবলী ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে সকল সমাজেরই আদরের জিনিষ।

শ্রীচৈতন্য—বিশ্বম্ভর বা নিতাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস ছিল উৎকলের জাজপুর নগরে। রাজার অত্যাচারে পলায়ন করিয়া শ্রীহট্টদেশে বড়-গঙ্গা নামক স্থানে তিনি বাসস্থাপন করেন। জগন্নাথ অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ আসেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি দশম গর্ভের সন্তান। প্রথম আটটি সন্তান শৈশবেই ইহলীলা সংবরণ করে। নবম গর্ভের সন্তান বিশ্বরূপ ষোড়শ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর, তাঁহার মাতা মৃতবৎসা বলিয়া কুলমহিলাগণ তাঁহাকে নিমাই বলিত, গৌর-বর্ণের জন্য প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গ নাম দিয়াছিল। নবমবর্ষে তাঁহার উপনয়ন হয়, একাদশ বর্ষে পিতৃবিয়োগ হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ সাঙ্গ করেন। তিনি তৎপরে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া শুনিলেন লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মাতৃ আদেশে তিনি পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। গয়ায় পিতৃপিণ্ড দিতে গিয়া সেখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি

মন্ত্র গ্রহণ করেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সঙ্গিগণ বহুকষ্টে তাঁহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনে। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন এবং অধ্যাপনাদি ত্যাগ করেন। এই সময় শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং নিত্যানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তিনি ক্রমশঃ কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠেন। জগাই মাধাই নামক দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণদ্বয় তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠে। এই সময় মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহ হইতে তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। পুরুষোত্তমে ধ্যানপুরী, কৃষ্ণদাস; হরিদাস, নরহরি, শঙ্করভারতী, চিদানন্দগিরি প্রভৃতি তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন। পুরুষোত্তমে তিন মাস অবস্থান করিয়া তিনি দক্ষিণাপথ গমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রামগিরির রাজা ও ঢুণ্ডিরাম তীর্থকে বিচারে পরাজিত করিয়া দীক্ষা দান করেন। তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন। তিনি গৌড়ের রামকেলি গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনে ও পুরুষোত্তমে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ গুণ্ডিচা বাড়ির গর্ভগৃহের পাষাণাচ্ছাদনের নিম্নে সমাহিত করা হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য ও বারভুইয়া—প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব। তিনি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যজ্ঞের ঋত্বিক। তাঁহার সমসাময়িক বারভূঁইয়ার ইতিহাস বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস।

সীতারাম রায়—চাকলা ভূষণার মধুমতী নদীতীরে হরিহরনগর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে বিশ্বাস বংশে সীতারাম রায়ের জন্ম। কর্ম্মঠ বলিয়া সীতারাম নবাব সরকার হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ সাহসের বলে ক্রমশঃ তিনি সমগ্র মহম্মদাবাদ পরগণার ভূস্বামী হইয়া উঠিলেন। চাকলা

ভূষণা নদীবহুল স্থান, পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা প্রাকৃতিক গড় খাতের মত ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। দক্ষিণে সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ইহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালী লাঠি তরবারি ব্যবহারেও অভ্যস্ত ছিল, সেজন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে সীতারামকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই। সীতারামের রাজপুরীর প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ মাগুরা সবডিভিসনের সাত ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে মহম্মদপুরে দেখা যায়। সীতারাম চতুষ্কোণ মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ ও নগর পত্তন করিলেন, ওই দুর্গের বহির্ব্বেষ্টনের পরিমাণ ক্রোশাধিক হইবে। দুর্গমধ্যে 'রামসাগর' ও 'সুখসাগর' নামক বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিলেন, শিল্পী আনাইয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা করিলেন। এইবার বাদশাহ দরবারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিলেন। তাঁহার অনেক তীরন্দাজ ও রাজবংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদারকে গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি গভীর বনভূমিতে অদৃশ্য হইতেন। একদা তাঁহার সৈন্যেরা ভুলক্রমে ফৌজদারকে নিহত করিলে তৎকালীন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অন্যান্য হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া শূলে চড়াইয়া নিহত করেন।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস—কৃত্তিবাস ওঝা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাণ্ডিত্য দ্বারা গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেন। শত শত রামায়ণ লিখিত হইলেও একে একে সবগুলিই কৃত্তিবাসের লিখিত রামায়ণের মাধুর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে।

কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। অননুকরণীয় সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিয়া ইনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৬৩৪—১৬৮২) বর্দ্ধমান জেলায়

পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান রাজপরিবার কর্ত্তৃক ইহার বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। ইনি অবশেষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি পদ লাভ করেন। "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" লিখিয়া ভারতচন্দ্র অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

শুভঙ্কর—ইহার প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। "শুভঙ্কর" ছিল তাঁহার উপাধি। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি গণিতের অনেক জটিল নিয়ম সুগম সরল আর্য্যায় পরিণত করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার গণিত বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। "শুভঙ্করী" এখনও আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত।

রাজা রামমোহন—স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত রামমোহন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। বাঙ্গালায় শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া চিরদিন তোমার জয়গান করিবে"। তিনিই য়ুরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন।

বঙ্গদেশে যে আজ বেদ ও বেদান্ত ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের এত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল রামমোহন। তিনি কাশীধামে গিয়া বেদ বেদান্ত মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। হিন্দু কলেজ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত। সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী। স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের তিনিই অগ্রণী। বিলাত যাত্রা প্রবর্ত্তনেরও তিনি পথ-প্রদর্শক। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রধান যোদ্ধা। দেশীয় লোকের উচ্চ রাজপদ লাভের আন্দোলন তিনিই সৃষ্টি করেন। খৃষ্টান পাদরীগণের সহিত সুদীর্ঘকাল তর্ক বিচার দ্বারা তিনি বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন। তিনি গদ্য সাহিত্যের জনক, তাঁহার গদ্য হইতে আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি যে জটিল ও দুরূহ বিষয়গুলি বাঙ্গালার সাহায্যে বোধগম্য করা সম্ভব। তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক ও হিন্দুকে বহুযুগের আচার ও কুসংস্কারের জীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার অগ্রদূত। তিনি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। "তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সার কথা উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্য্যাবসান নহে,—এই বোধ না থাকায় রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্যযুক্ত-চিত্তের মানুষ না হওয়ায় রামমোহন এদেশের মন যাহা চায় তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্ম্মগুরু হইতে পারেন নাই।"

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭ খ্রীঃ) শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত একদা বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা কখনও ত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালার সামাজিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীকে তিনি আত্মরক্ষার পথ দেখাইয়াছিলেন। তিনি British Indian Associationএর আজীবন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিবিধ ভাষায় সুপাণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুও অতীব আশ্চর্য্যজনক। তিনি মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে দুগ্ধপান করিয়া ভৃত্য নবীনকে বলেন, "আজ আমার শেষ দিন।" তৎপর কিরূপে তাঁহাকে দাহ করিতে হইবে এবং দেহাবশেষের কিরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। পরে তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসীতলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজের শয্যায় শিরভাগে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া শয়ন করতঃ মালা জপ করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টাকাল জপ করিতে

করিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করিল। তাঁহার অমর কীর্ত্তি,—৪৬ বৎসর পরিশ্রমের ফল হইতেছে "শব্দকল্পদ্রুম।" রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন—

"হে বিদ্বান-কুল ধন, যতন প্রচুর
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার!
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর
'শব্দ-কল্প-দ্রুম' নাম অভিধান সার;
অপূর্ব্ব এ অভিধান।" * * *

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য), ঈশ্বর গুপ্ত—এককালে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে সকলেই চিনিত। তাঁহার "সংবাদ ভাস্করের" নাম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সগৌরবে উল্লেখযোগ্য। ১২৪২ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। "ভাস্করের" সহিত ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকরের" কবিতাযুদ্ধ সেকালে দেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহাকে জজ পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,—'ভাস্কর' ভিন্ন অন্য কোন কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্যক নাই"। এ ত্যাগস্বীকার এক-দিন বাঙ্গালী জীবনে অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল না।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ খ্রীঃ)—মাত্র ৩৭ বৎসর-কাল ছিল তাঁহার পরমায়ু। ১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ মাত্র চারি বৎসর কাল তিনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্র সম্পাদনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে কীর্ত্তিগৌরব রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবে। স্পষ্টবাদীতায়, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে, পরদুঃখকাতরতায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি খুবই কম জন্মিয়াছে। তাঁহার অল্পপরিসর সম্পাদক-জীবন মধ্যে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকরগণের অত্যাচার, সনন্দপত্রের পূনঃসংস্কার, অযোধ্যাকে অধিকারভুক্তকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও মহারাণীর হস্তে

রাজ্যশাসনভার গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটি যুগান্তরকর ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার লেখনী সম্পাদকের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সিপাহী-বিদ্রোহ দমিত হইলে একদা বড়লাট-প্রাসাদ হইতে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাসাবাটীতে একখানি পত্র লিখিত হয় যে, "আপনি কোন্ দিন সময় করিয়া, কখন লর্ড ক্যানিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন? বড়লাট বাহাদুর আপনার সহিত শাসন সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহেন।" তিনি এই পত্রের সদ্য সদ্য এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি। আমার পক্ষে বড়লাট দর্শন শোভন হইবে না। তিনি এদেশে বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি; ব্যক্তিগত ও পদগত অতি প্রবল মহিমার দ্বারা আমার মত দরিদ্রের মন আচ্ছন্ন এবং বিমুগ্ধ হইতে পারে। পাছে বিমূঢ় আমি বাজে কথা কহিয়া ফেলি, সেই ভয়ে আমি লাটপ্রাসাদে যাইব না। দরিদ্রের প্রতিনিধি আমি, আমার জাতির ও দেশের সম্বন্ধে "হিন্দু পেট্রিয়টে" আমি যাহা লিখিয়া থাকি, তাহাই আমার বক্তব্য; 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' যখন লর্ড ক্যানিং নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন তখন আমার তাঁহাকে নূতন কিছু বলিবার নাই। আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা, অভাব অভিযোগের কথা আমি বড়লাট বাহাদুরকে শুনাইতে চাহি না। অতএব আমি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" ইহা আজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজও গরমপন্থী অনেক নেতা এরূপ লেখা দূরের কথা এরূপ কথা মনে ভাবিতেও পারেন না। তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী ভবানীপুর হরিশপার্কে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার আদর্শ জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে কবিরা গান বাঁধিয়াছিল,—"নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার। অসময়ে হরিশ মলো—লংএর হলো কারাগার।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩—১৮৬৮ খ্রীঃ)—ইনি এদেশের ধনীদিগের সম্মুখে শ্রমের মর্য্যাদার আদর্শ স্থাপন করেন। ধনীর সন্তান হইয়াও তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার আয় বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা হইত। তিনি লাখরাজ বাজেয়াপ্তীর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া ৫০ বিঘার অনধিক লাখরাজ জমিগুলির বাজেয়াপ্তী রহিত করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনিই প্রথম বাঙ্গালী সদস্য। "ঠাকুর-ল-লেকচারের" জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। মূলাজোড়ের সংস্কৃত শিক্ষালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৩৫ হাজার টাকা, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য এক লক্ষ টাকা, অনুগত আত্মীয় স্বজন ও কর্ম্মচারীর জন্য দুই লক্ষ পনর হাজার টাকা, এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করেন। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পর তিনি British Indian Associationএর সভাপতি হন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্মরণীয় থাকিবে। তিনি আইন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেনেট গৃহের বারাণ্ডায় তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১—১৮৭০ খ্রীঃ)—মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গালাদেশ বদান্যতার অবতার, দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের সহায়, গুণীর গুণজ্ঞ এই পুরুষসিংহকে হারাইয়াছে। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। লঙ্ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হইলে তিনিই অযাচিতভাবে সেই হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্য লিখিলে তিনিই সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র ও উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর সাহিত্যজীবনের উন্মেষে, গিরিশচন্দ্রের নাট্য লিখনে, ও সংস্কৃতকাব্য অনুবাদ করিয়া তাহার নাট্যাভিনয়ে তিনিই ছিলেন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষার একখানি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক। তাঁহার "হুতুম পেঁচার নক্সা" অনেক ভণ্ডকে সংশোধন করিয়া দিয়াছে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৩ খ্রীঃ)—যদি 'নীলদর্পণ' মাত্র লিখিয়া লেখনী সংযত করিতেন তথাপি বাঙ্গালাদেশে দীনবন্ধু মিত্রের নাম অমর হইয়া থাকিত। এই গ্রন্থখানির প্রচার দ্বারা 'নীলকর-দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট' নিবারণ হইয়াছিল। এই বইখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাদরী লঙ্ অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, 'এমন সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই'। বঙ্কিমবাবু নীলদর্পণকে Uncle Tom's Cabin এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। দীনবন্ধুর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে তাঁহার মত উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা হাস্য-রস প্রধান ছিল

• **প্যারীচাঁদ মিত্র** (টেকচাঁদ ঠাকুর)—প্যারীচাঁদ ও নীলমণি বসাক পণ্ডিত-বাঙ্গালা যুগে সহজ রচনা রীতির প্রবর্ত্তন করেন। প্যারীচাঁদের পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় সামাজিক বিষয়ে কেহ কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল", "মদ খাওয়া বড় দায়" বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকিবে। তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। "তিনিই প্রথম দেখাইলেন, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গালা কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮—১৮৮৪ খ্রীঃ)—মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস পাল "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইলবার্ট

বিল, মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিধান, আসামের কুলি আইন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে আজও প্রতিধ্বনিত। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন প্রভৃতি উদার মতাবলম্বী বড়লাটগণও কখনও তাঁহাকে লাট বাড়ীতে এক পেয়ালা চা পান করাইতে পারেন নাই। ইলবার্ট সাহেব তাঁহার বিলের বিপক্ষে কৃষ্ণদাসের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এরূপ ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন দেশে যশস্বী হইতে পারেন।" রাজা ও ভিখারী তাঁহার নিকট সমভাবে সমাদর পাইতেন। তাঁহার মতন বাগ্মী স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কেহ জন্মান নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৩—১৮৮৬ খ্রীঃ)—হুগলী জেলায় কামার-পুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে 'গদাই' এর নাম :পরিবর্ত্তন করিয়া রামকৃষ্ণ রাখা হয়। দশ এগার বৎসর বয়সেই তাঁহার ভিতর ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। বাল্যকাল হইতেই শ্যামাসঙ্গীত, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামকুমার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি পূজারীর পদ গ্রহণ করেন ; রামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে আসেন। রামকুমারের অবস্থার উন্নতি হইলে সারদা দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ দেন। ইহার অল্পকাল পরে রামকুমারের মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের পদে বাহাল হন। পূজা করিতে বসিয়া রামকৃষ্ণ আত্মহারা হইতেন। কখনও দেবী মূর্ত্তির মস্তকে পুষ্প চন্দন না দিয়া নিজের মাথায় দিতেন, কখনও আরতি করিতে করিতে নৃত্য করিতেন, কখনও মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। অবশেষে তিনি পঞ্চবটীমূলে আসন স্থাপন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। দশ বৎসরকাল তিনি তথায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার কামিনী কাঞ্চনে কোন আকর্ষণ ছিল না। গঙ্গার জলে টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিতেন, 'টাকা মাটি', মাটি টাকা'। তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তিনি অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় দৃষ্টান্তের দ্বারা

জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সাধারণ লোকেরও বোধগম্য করিতেন। ভগবানের নামেই অনেক সময় তাঁহার সমাধি হইত। জীবে এবং সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার সমান স্নেহ ছিল। তাঁহার নিকট সকল ধর্ম্মবাদ সমান ছিল। তিনি শাক্তও ছিলেন, শৈবও ছিলেন। তিনি কোন প্রকার আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। গৈরিক বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিয়া, লালপেড়ে ধুতি পরিধান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, যোগবলে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবানে সংযুক্ত থাকে। তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত হন।" তিনি গলক্ষত রোগে ইহলীলা সংবরণ করেন। বেলুড় মঠে তাঁহার শতবার্ষিকী মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে রাজা রামমোহন প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম্ম রোধ করিতে যে প্রয়াস করেন, রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২—১৯০২ খ্রীঃ)—কলিকাতার সিমলা অঞ্চলবাসী হাইকোর্টের উকিল বিশ্বনাথ দত্ত স্বামিজীর পিতা। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রার্থে শিবপূজা করিয়া এই পুত্র লাভ করেন। বাল্যের তাঁহার নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন, তাই মাতা ভুবনেশ্বরী বলিতেন, 'মহাদেব নিজে না এসে একটা ভূত পাঠিয়েছেন'। কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে বাড়ীর মেয়েদের মজলিসে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ হইত যখন তখন নরেন্দ্র শান্ত হইয়া শুনিত। পাড়ায় কথকতা হইলে দুরন্ত নরেন্দ্রনাথ সেখানে বাসা বাঁধিত। নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক ছিল। কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই ঈশ্বরের খোঁজ করিতেছিলেন। যখন কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের খোঁজ দিতে পারিল না তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। ঠিক এমন সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া

বলিলেন, 'তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি? আমি কতদিন থেকে তোর পথপানে চেয়ে বসে আছি। ভগবান তোকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন'। স্তম্ভিত নরেন্দ্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন'? ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ, এত স্পষ্ট ভাবে, যেমন তোকে দেখছি'। এইবার নরেন্দ্র ঠাকুরের উপদেশ মত সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি বি-এ পাশ করিলেন। এদিকে পিতাও কিছু না রাখিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। সংসারের চাপে তিনি সংসারী হইতে চাহিলেন, কিন্তু মন তাঁহাকে বৈরাগ্যের পথে টানিল। ঠাকুরের আদেশে তাঁহার জীবিত কালে নরেন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইল না। অবশেষে ঠাকুরের চরম রোগ দেখা দিল। ঠাকুর তাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় উপদেশ দিলেন, "তোকে কাজ করতে হবে, স্বার্থপর হইয়া নিজের মুক্তির এখন চেষ্টা করিস্ না। যে মানুষ ভগবানকে চায় তাহাকে প্রথমে ভগবানের সন্তান মানুষকে ভালবাসিতে হয়।" এইবার ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহারা বারজন যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—বরাহনগরের একখানি পুরাতন ভাড়াবাটীতে মঠ স্থাপিত হইল। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই—তপস্যা ও কীর্ত্তন তখন তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ও উপজীব্য হইল।

অনন্তর বিবেকানন্দ ভারতভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিজী হিমালয়ে গিয়া অন্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল তপস্যা করিলেন। পরে তিনি পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আলোয়ারে আসিয়া সেখানকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজা স্বামিজীকে বলিলেন, "আমার মাটি, পাথর, ধাতু-নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলির উপর ভক্তি নাই, এবং কি জন্যই বা ভক্তি করিব?" স্বামিজী তাহার উত্তরে মহারাজার একখানি ফটোগ্রাফ ভূমিতে রাখিয়া সকলকে তাহাতে থুতু ফেলিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই রাজী হইল না। তখন স্বামিজী মহারাজাকে বলিলেন, "দেখুন, যদিও ছবিখানির ভিতর আপনি নাই তথাপি আপনার

প্রতিকৃতির উপর থুতু ফেলিতে কেহ রাজী হইল না, কারণ সকলে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। হিন্দুরাও মাটি, পাথর পূজা করে না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ভগবানকে পূজা করে"। স্বামিজীর উপদেশে মহারাজের চৈতন্য হইল। অতঃপর স্বামিজী সমস্ত ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া কন্যাকুমারিকার সমুদ্র কূলে দেহত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভারতের দুঃখের কথা স্মরণপথে আসায় তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, আর মরা হইল না।

ইহার পর তিনি আমেরিকায় সিকাগো সহরে ধর্ম্মসভায় যোগ দিতে গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। আট দশ হাজার শিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাহাতে আমেরিকায় ভারতের ধর্ম্ম-গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইল। অতঃপর তিনি সমগ্র যুরোপ পরিভ্রমণ করেন। চারি বৎসর পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার পথে সিংহলে ও মাদ্রাজে তাঁহার বিপুল অভ্যর্থনা হইল। কলিকাতায় তাঁহার শিষ্য সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে লাগিলে তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠা করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই এই মিশনের উদ্দেশ্য। ১৮৯৮ খ্রীঃ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দিল। স্বামিজী ভগ্নস্বাস্থ্য-সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদের সাহায্যে প্রাণান্ত চেষ্টায় সেবাকার্য্য চালাইলেন। অর্থাভাব দেখা দিলে বলিয়াছিলেন, "জীবের সেবায় মঠের জমি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে একটুও দ্বিধা করিব না।" তাঁহার উপদেশ ছিল, "উঠ, জাগ, আর কতদিন ঘুমায়ে থাকিবে। তোমাদের মধ্যের অনন্তশক্তি জাগাইয়া তোল"।

তিনি দ্বিতীয়বার যুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে যাহাতে কোন অভ্যর্থনাদি না হয় সেজন্য সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া বিলাতী পোষাক পরিয়া সকলের অগোচরে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌছান।

ইতিপূর্ব্বেই তিনি মায়াবতীতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইবার তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে অসুস্থ হইয়া শিলং গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া কিছুদিন বিশ্রামান্তে দুইজন

জাপানী বন্ধুর সহিত বুদ্ধগয়ায় যান। সেখান হইতে কাশী গিয়া ভবিষ্য রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বীজ বপন করিয়া আসেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই কাহাকেও পূর্ব্বাহ্নে কিছু জানিতে না দিয়া রাত্রি ৯টার সময় তিনি মহাসমাধি-যোগ দ্বারা দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর। দেশ ও দরিদ্রনারায়ণ তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল। নির্ব্বাণলাভ করিবার পূর্ব্বে আসমুদ্র-হিমাচলকে তিনি এই অমর বাণী দিয়া গিয়াছেন—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না—তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদাই বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" বিবেকানন্দ স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ ও সেবাধর্ম্ম প্রচার করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ত্তমান সেবাকার্য্য জগৎব্যাপী। বেলুড় মঠের অধীনে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান (মিশন ও মঠের) কার্য্য চালাইতেছে। উহাদের মধ্যে ৩১টি বাঙ্গালাদেশে, ২টি আসামে, ৬টি বিহারে, ২টি করিয়া উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মহীশূরে, ১১টি যুক্তপ্রদেশে, ১টি করিয়া দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু, কোচীন, কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুরে, এবং ৬টি মান্দ্রাজে সেবা ও শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ইহা ছাড়া ভারতের বাহিরে বর্ম্মায় ২টি, সিংহলে ৪টি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারলণ্ড, আর্জ্জেন্টিনা ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক একটি করিয়া এবং আমেরিকায় ১১টি কেন্দ্র আছে। ছোট বড় সমস্ত কেন্দ্র লইয়া ১৯৩৭ সালে মোট সংখ্যা ১০৮

দাঁড়াইয়াছে। মিশন ও মঠের অধীনে নয়টি হাসপাতাল, ৪৩টি ডিস্‌পেন্‌সারী, ৩৩টি সেবাকেন্দ্র, ১২টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ৫টি কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়, ৫টি মধ্য ইংরাজী ও ৫৭টি উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত শিক্ষালয় পরিচালিত হইতেছে। মিশনের স্থাপিত অনেকগুলি গ্রন্থাগার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রভৃতিও আছে। ইহা ছাড়া লোকহিতকর বহুতর কার্য্যে মিশন নিযুক্ত আছে। জাতিনির্ব্বিশেষে আতুর ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা মিশনের ধর্ম্ম। মিশনের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৬ লক্ষ মুদ্রা। ইহার স্থায়ী ফণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১২২৮—১২৯৮ সাল)—রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চায় অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১২৮ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, পারসি, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মানভাষা জানিতেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, এল, উপাধি দান করে। তিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রথম এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনাপূর্ণ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)—বিদ্যার সাগর—বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর—বিদ্যাসাগর, পুরুষ সিংহ বিদ্যাসাগর, নব্য বাঙ্গালার শিক্ষাগুরু। তাঁহার মনুষ্যত্ব ছিল সজীব—দেশাচারের বাধা, সমাজের ভ্রূকুটী, অর্থের ও পদের প্রলোভন কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে কখনও এক পদও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, হিন্দু ছিলেন—সমাজ সংস্কার কার্য্যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধারা কখনও ত্যাগ করেন নাই। বিধবা বিবাহ তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অর্থ, সামর্থ্য, খ্যাতি, পদগৌরব কিছুই দৃক্‌পাত করেন নাই।

তিনি বেশ ভূষায়, চিন্তায়, ত্যাগে, পরোপকারীতায় খাঁটী বাঙ্গালী

ছিলেন। সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হইলেও প্রাণ ছিল তাঁর নবনীত কোমল। বাল-বিধবার কষ্ট যেমন তাঁহাকে মুহ্যমান করিত, দুগ্ধের জন্য গো-বৎসকে বঞ্চিত করিতেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এইজন্য তিনি কখন দুগ্ধ পান করেন নাই। তাঁহার মাতৃভক্তি সকলের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্থাপিত 'মেট্রোপলিটন কলেজ' আজ 'বিদ্যাসাগর' কলেজ নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। দানে তিনি ছিলেন দাতাকর্ণ, নিজের না রাখিয়া বিলাইয়া দিতে তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও দেখা যায় নাই। মাইকেল অসময়ে একমাত্র তাঁহাকেই বন্ধু পাইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অতুল। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর চির নমস্য।

কবিগুরু বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলি আজ বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া সমগ্র ভারতে পঠিত হইতেছে। তাঁহার আদর্শ ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র "An apostle of culture"। তাঁহার জীবনবেদ ছিল—"Substance of religion is culture"। তাঁহার সাহিত্য এত উচ্চ আদর্শের যে অর্দ্ধশতাব্দীর বহু পূর্ব্বে লিখিত হইলেও তাঁহার নীতিগুলি বর্ত্তমান সমাজ আদর্শের এখনও বহু উর্দ্ধে। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ তিনি "আনন্দমঠে" চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র ভারতবর্ষে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়া এই মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর মন্দ্রে উদাত্ত স্বরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। এই মহামন্ত্র মরণপথের যাত্রীকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়াছে, দেশ মাতৃকার সেবকের কণ্ঠে ভাষা, বাহুতে শক্তি, মনে বল, ত্যাগে শান্তি, ও কর্ম্মে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছে; এই মাতৃমন্ত্রই হতাশে আশ্বাস, মৃত্যুতে চেতনা, দুর্য্যোগে সাহস, ও পরাজয়ে বিজয় আনিয়াছে। এই মাতৃসঙ্গীতের তাৎপর্য্য যতখানি আমরা বুঝিয়াছি তাহা অপেক্ষা অনেকখানি বেশী আমরা বুঝি নাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে বঙ্কিমবাবু ছিলেন তক্মা আঁটা সরকারী গোলাম। যদি আমরা এইটুকু ভাবি যে আনন্দমঠের ন্যায় স্বাদেশিকতা

প্রচারক পুস্তক যাহা বাঙ্গালার অগ্নিযুগে গুপ্ত সমিতির সভ্যদের আদর্শ ও গীতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই পুস্তক সরকারী চাকুরিয়া হইয়া লেখা কতদূর বিপজ্জনক এবং কত অসম্ভব আবর্জ্জনা দ্বারা তাহা ঢাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুকে ও তাঁহার আনন্দমঠকে আমরা সাম্প্রদায়িকতা-বিষ-দোষ-দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে পারি এবং তাঁহার অমর দান নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারি। জানা গিয়াছে যে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর নিবাসী দত্ত বাবুদের বাটীর দুর্গাপ্রতিমা দর্শনে এই "বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্র তাঁহার মানস আকাশে উদিত হয়।

তাঁহার মনীষা ছিল অনন্যসাধারণ। আজকাল বিলাতে কিষাণ ও মজদুর আন্দোলনের বামপন্থী নেতারাও আপনাদের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই, ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া "কৃষকের দুর্দ্দশা" প্রবন্ধে প্রাঞ্জলভাবে তাহা সম্যক্ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে আর একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—'আমাদের সব ছিল কেবল জাতীয়তা জ্ঞান ছিল না, ইংরাজ উহা আমাদিগকে শিখাইয়াছে"।

তাঁহার ধর্ম্মের রূপ ছিল নিষ্কামতা। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি দেবতাকে মহামানবতার কেন্দ্র এই রূপ দিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার "বঙ্গদর্শন" মাসিক সাহিত্যের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল,আজ বোধ হয় আমরা তাহা হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছি।

কবি রঙ্গলাল—পদ্মিনী উপাখ্যানই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈরী ঘটিয়াছে। এই জাতি বৈরভাব হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। ভারতে স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—(১৮২৫—১৮৯৪ খ্রীঃ) ভূদেবের জীবন—

খাঁটী হিন্দু বাঙ্গালীর আদর্শ জীবন। এই আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে তিনিই কেবল আত্মবিস্মৃত ছিলেন না। স্বদেশীয় শাস্ত্রে, স্বদেশীয় আচারে, স্বদেশীয় সমাজে, স্বদেশীয় ধর্ম্মে, স্বদেশীয় সাহিত্যে, তাঁহার আস্থা ও ভক্তি অচলা ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতি বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতি সহানুভূতিকেই পরম ধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।"

তিনিই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম "ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক ইন্সট্রাক্শান্" পদ প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন।

রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার—রজনীকান্ত পাঁচখণ্ডে "সিপাহী যুদ্ধের" বিরাট ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে ঐরূপ বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। তিনি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা অক্ষয়চন্দ্র। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" তুল্য পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পথ তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কংগ্রেস আন্দোলন—"সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়া আছে; লালা লাজপৎ রায় বল, মদনমোহন মালব্য বল, ফিরোজসাহ মেটা বল সকলের

যশ নিজ নিজ প্রদেশে বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ। ধন ও রাজপ্রসাদ তাঁহার প্রাথমিক উন্নতির সোপান হয় নাই। কংগ্রেসের শৈশবকালে তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ প্রাণপণে তাঁহাকে বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অসমসাহসিক বা ফলাফল বিচার রহিত বীরত্বের অধিকারী ছিলেন না বটে, কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দাস্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, সে বীরত্ব ও সে সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবহার মধ্যে পড়িয়াও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী, আত্মরক্ষার ও আত্মচরিতার্থতা লাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটী লাভ করিয়াছিলেন"।

আপনার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই সুরেন্দ্রনাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত হ'ন, সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। আসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক হইলেন। উচ্চ রাজপদের সকল আশা সমূলে উৎপাটিত হইলে তিনি স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবন সৃষ্টি ও তাহার বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যদিও তাঁহার মত প্রীতিশীল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশে বিরল, তথাপি প্রথম জীবনের নবীন পুত্রশোক ও শেষ জীবনের নিদারুণ পত্নীবিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টায় কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারতসভার প্রতিষ্ঠা দিনে সুরেন্দ্রনাথের পুত্রবিয়োগ হয়। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন উক্ত সভায় তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই শোকাহত সুরেন্দ্রনাথ চক্ষের জল ও অঙ্গের ধূলি মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার দেখা যায় বৃদ্ধ বয়সে পত্নীশোকে সুরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও আপনার দৈনন্দিন

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই মুক্তভাব ছিল স্বভাবসিদ্ধ।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দ-সম্পদের উপর নির্ভর করিত। সঙ্গীতের ন্যায় উহা শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িত-সঞ্চার করিত। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতির সহিত একটা বিজাতীয় পরাজিত বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন", ও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনমোহন প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নানাদিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চও এই স্বদেশপ্রীতিতে উদ্দীপনা দান করে। এইরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথম সহকর্ম্মী পাইলেন আনন্দমোহন বসুকে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-সভায় "শিখ-শক্তির অভ্যুদয়" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করেন তাহাতে প্রথম জাতীয়তার ধারণা বাঙ্গালীর মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে। ছত্রপতি শিবাজীর হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মর্ম্ম তিনিই প্রথম উদ্ঘাটিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বভারতীয় যে আদর্শ বাংলার সম্মুখে স্থাপন করিলেন, সে আদর্শ মহারাষ্ট্র বা পঞ্জাব নিজ নিজ প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন থাকায় ধরিতে পারিল না। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার শাখা প্রশাখা দ্রুতগতিতে ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে।

লর্ড ডাফরিণের সাহচর্য্যে এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন পণ্ড করিবার জন্যই কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া লোকে অনুমান করে। যখন কলিকাতায় National Conferenceএর অধিবেশন হইতেছিল, সেই সময়েই গোপনে গোপনে বোম্বাইএ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারীই কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লর্ড

ডাফরিণকে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ভারতের জেলায় জেলায় যে রাষ্ট্রীয় সভা সুরেন্দ্রনাথ গড়িয়া তুলিতেছিলেন এইরূপে কংগ্রেসের উৎপত্তিতে তাহা ব্যাহত হইল। বিগত দশ বৎসরে কংগ্রেস যে শক্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, ভারত-সভা বহু বৎসর পূর্ব্বেই তাহা সঞ্চয় করিতে পারিত। যাহা হউক, অবশেষে আজ কংগ্রেস দেশের একমাত্র শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে আপনা হইতেই কংগ্রেসের কথা আসিয়া পড়ে। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ইহার সভাপতি হ'ন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির হয় যে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ইংরাজ ভারতবর্ষের শাসক থাকিবে, ভারতবাসীরা ইংরাজের রক্ষণাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিবে।" এই লক্ষ্য ১৮৮৫ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকে। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আলোড়িত করে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী হ'ন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বরিশালের অশ্বিনী দত্ত, ঢাকার আনন্দ রায়, ফরিদপুরের অম্বিকা মজুমদার, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, বর্দ্ধমানের নলিনাক্ষ বসু, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। মর্লির settled fact সুরেন্দ্রনাথ unsettled করেন।

বাঙ্গালাদেশে তথা সমগ্র ভারতে শীঘ্রই নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুইটি রাজনৈতিক দল সৃষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে সুরাটে এই দুই দলে সংঘর্ষ হয়। চরমপন্থীদল ইহার সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পরে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস দখল করে। অতঃপর নরমপন্থী দল কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিগত ৫২ বৎসরে ১৩ জন বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন।

প্রথম ৩২ বৎসরে দশ জন, শেষ ২০ বৎসরে মাত্র তুইজন বাঙ্গালী সভাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বহুবর্ষ ধরিয়া কংগ্রেস বাঙ্গালীর করতলগত ছিল। এখন মহাত্মা গান্ধীই ইহার পরিচালক।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৫ সালে পুণা ও ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হ'ন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫ সালে ও ১৮৯২ সালে সভাপতি হ'ন। ১৮৯৫ সালে আনন্দমোহন ও পর বর্ষে রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০২ সালে লালমোহন ঘোষ, ১৯০৮ সালে রাসবিহারী ঘোষ, এবং ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার এস্, পি, সিংহ ও অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতি হ'ন। ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ গয়ার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ সভাপতি-রূপে নিজ নির্ব্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটীর বিনানুমতিতে) সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হ'ন। ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটীর দক্ষিণপন্থী সভ্যরা মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতায় তাঁহাকে সভাপতিপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন।

১৯১৯ খ্রীঃ যে রাষ্ট্রশাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ উহার মন্ত্রি-সভায় যোগ দেন। স্বায়ত্বশাসন বিভাগে মন্ত্রিত্বকালে তিনি বিখ্যাত 'কলিকাতা কর্পোরেশন বিল' পাশ করেন। শিক্ষক হিসাবেও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তিনিই সুবিখ্যাত রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উমেশচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা সত্য নহে। তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়াছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উহাতে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক বাটীর অর্দ্ধাংশ কুল-দেবতার নামে দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে পাদরীগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যদি Trinity পূজা কর, আমি তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজা করিব না কেন?"

কংগ্রেস তাঁহারই অর্থে পুষ্ট। তিনি ১৮৮৫ সালের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯২ সালেও তিনি ওই পদে দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ সালে হিউম ভারত ত্যাগ করিলে তিনিই কংগ্রেসের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। কংগ্রেস-প্রীতির জন্য তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে বঞ্চিত হ'ন। তিনি তৎকালীন ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে ক্রয়ডন নামক স্থানে "খিদিরপুর হাউসে" দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চিতাভস্মের উপর লিখিত আছে, "ইহাই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হিন্দু ব্রাহ্মণের অন্তিম শয্যা"।

ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন—ইঁহারা দুইজনেই স্বদেশী যুগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রসুল সাহেব সুরেন্দ্র-নাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। লিয়াকৎ দেশের জন্য কারাবরণ এবং দুঃখ-দারিদ্র্য সহাস্যমুখে বরণ করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরবরেণ্য হইয়া থাকিবে।

মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—মধুসূদন হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইংরাজীতে প্রথমে তিনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বনে "ক্যাপটিভ্ লেডি" নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি আদৃত হইলেও বেথুন সাহেব তাঁহাকে বলেন যে বাঙ্গালী-লিখিত ইংরাজী কাব্য ইংরাজী সাহিত্যে কখনও সমাদর লাভ করিবে না। মাতৃভাষার চর্চ্চা ভিন্ন সাহিত্যে কবির আসন লাভ করিতে তিনি কখনও সমর্থ হইবেন না। বেথুনের এই উপদেশে তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ আরম্ভ করেন "শর্ম্মিষ্ঠা" তাঁহার প্রথম নাটক। তাহার পর গদ্যে ও পদ্যে "পদ্মাবতী" নাটক লিখিয়া তিনি যশঃলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" বঙ্গ-সাহিত্যে এক বিষম বিপ্লব আনয়ন করে। ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির অনুসরণকারী লেখকেরা সকলেই একবাক্যে এই চেষ্টার নিন্দা

করেন এবং অজস্র বিদ্রূপবাণ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়। কিন্তু তিনি ইহাতে ভীত বা ভগ্নোদ্যম না হইয়া বাঙ্গালা ভাষার যুগান্তকারী কাব্য "মেঘনাদ-বধ" প্রণয়ন করেন। এই কাব্যই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এই নূতন কাব্য পাঠ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করেন। মধুসূদন আরও কয়েকখানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

মধুসূদন আত্মসংযমের অভাবে কখনই সুখী হ'ন নাই। "একদিকে যেমন তিনি সরল, অমায়িক, বিদ্যোৎসাহী, প্রকৃতকর্ম্মী, সংকল্প সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সৎসাহসী ছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি ভোগী, বিলাসী, অপরিণামদর্শী, উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী ছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত য়ুরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুসূদন। স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

বাঙ্গালা সাহিত্যে হেম ও নবীন সূর্য্য না হইলেও চন্দ্রবিশেষ। হেমচন্দ্রের "ভারতবিলাপ" বাঙ্গালার নবজীবন উন্মেষের অগ্রদূত। নবীনের কাব্যাবলী বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ—দেবেন্দ্রনাথ পৈত্রিক গোলপাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ বিষয়বুদ্ধির গুণে অল্পদিনে সহরের একজন ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হ'ন। বিলাতে তাঁহার অর্থব্যয় দেখিয়া লোকে তাঁহাকে "প্রিন্স দ্বারকানাথ" আখ্যা দেয়। ১৮ বৎসর বয়সে

স্নেহময়ী পিতামহীর চিতাপার্শ্বে দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম বিষয়াভিলাষে বিরাগ জন্মায়। ঈশ্বরকে পাইতে তিনি ব্যাকুল হ'ন। তাঁহার ৩০ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথের বিলাতে মৃত্যু হয়। হিসাবে প্রতিপন্ন হয় দ্বারকানাথের ঋণের পরিমাণ ১ কোটী টাকা এবং সম্পত্তির মোট মূল্য ৭০ লক্ষ টাকা। দ্বারকানাথ তাঁহার সম্পত্তির এমন বিলি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে উত্তমর্ণরা উহা বিক্রয় করিয়া লইতে পারিত না। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে মনস্থ করিলেন। উত্তমর্ণদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে নিজ ভরণপোষণের জন্য সামান্য মাত্র আয় ব্যতিরেকে তাঁহার বক্রী আয় ঋণ পরিশোধে ব্যয়িত হইবে। এইরূপ কৃচ্ছসাধন দ্বারা সমস্ত ঋণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিলেন।

উপনিষদের তিনটি উপদেশের উপর তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও তৎপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন—পরম ব্রহ্মের পূজা করিবে, পরধনে লোভ করিবে না, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবে। তাঁহারই অর্থে ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি দিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য্য পদে বরণ করেন। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রকৃতির সময়ানুবর্ত্তিতা দেখিয়া বলিতেন মনুষ্যের জীবনে এইরূপ সময়ানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ ও দেশপ্রীতি অনুকরণীয়। তিনি রক্ষণশীলই ছিলেন, ব্রাহ্মদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের তিনি সমর্থক ছিলেন না।

তিনি ছিলেন দানে মুক্তহস্ত, বন্ধুপ্রীতিতে স্নেহকোমল। বাঙ্গালা ভাষার তিনি ছিলেন অনুপম শিল্পী। ১৯০৫ সালে চুরাশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশব কলুটোলার রামকমল সেনের পৌত্র। তিনি ধনী ও সম্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার

প্রতিভার স্ফূরণ হয়। অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলেজ লাইব্রেরীতে দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিতেন। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। পর বৎসরই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিছুদিন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরি করিয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হ'ন। তাঁহার বাগ্মিতা সকলকে মোহিত করিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য পদে বরণ করেন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি দান করেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার ছয় বৎসর পর রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ ও প্রগতিশীল কেশবচন্দ্রের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছেদ হয়। ফলে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপিত হয়। এই নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মকে "নব বিধানে"র ব্রাহ্মধর্ম্ম বলে। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম "আদি ব্রাহ্মসমাজ" দেওয়া হয়।

কেশব সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার বাগ্মিতাশক্তির আদর হয়। ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। রামকৃষ্ণদেবের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি যে সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে—জাতিভেদ প্রথা রহিত, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন, পৌত্তলিকতা ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, গুরুবাদ প্রভৃতি।

শিষ্যগণের দ্বারা পাদপূজা করায় অনেক অনুচরই তাঁহাকে ত্যাগ করে। কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ লইয়া তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আরম্ভ হয়। পরে তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ লইয়া একদল ব্রাহ্ম পৃথক হইয়া পণ্ডিত শিবনাথের নেতৃত্বে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন।

কেশবচন্দ্র অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সহিত পণ্ডিত শিব-নাথের নামও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। শিবনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। তিনি ২৪ পরগণার মজিলপুর নিবাসী পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ধর্ম্মের অনুসন্ধানে তিনি স্নেহময় পিতামাতার ক্রোড় চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি প্রধান স্তম্ভ হ'ন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও শিবনাথ দিক্‌পাল-বিশেষ ছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতা, স্বদেশ-সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসাবলী ও জীবন-চরিত ("আত্মচরিত" ও "রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ") তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর গোস্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শবাদী হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের অবতারবাদ ও পাদপূজা তিনি বরদাস্ত না করিয়া কিছুকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং শান্তিপুর গিয়া ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন হয়। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের মতের কখনও সঠিক মিল হয় নাই। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মের বিগ্রহ রূপ মানেন না, কিন্তু বাইবেল ও কোরাণ নিরাকার বিগ্রহ রূপ স্বীকার করে। তিনিও ব্রহ্মের বিগ্রহরূপ মানিতেন। ব্রাহ্মরা জন্মান্তর মানেন না, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি সর্ব্বদাই মনে আসিত। ব্রাহ্মরা গুরুর নাম শুনিলেই কর্ণে অঙ্গুলি দেন, তিনি গুরু মানিতেন। ফলে ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তিনি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা ল'ন।

শেষ জীবনে তিনি পুরীধামে বাস করেন এবং "জটীয়া বাবা" নামে খ্যাত হ'ন। মহাপ্রভুর কৃপায় সমুদ্রে তাঁহাকে স্নান করিতে যাইতে হইত না।

সকলেই দেখিত তাঁহার জটা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তাঁহার সমুদ্র স্নান হইয়া গিয়াছে। পুরীর কোন মঠের শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণব মোহান্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে মিষ্টান্নের সহিত বিষদান করে। তিনি সমস্ত জানিয়াও মহাপ্রসাদ জ্ঞানে উহা ভক্ষণ করেন এবং অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইহার একমাস পরে তিনি দেহরক্ষা করেন। পুরীতে চন্দন পুষ্করিণীর তীরে জটীয়া বাবার বিরাট সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—বাঙ্গালীর উপনিবেশ (পৃষ্ঠা ৮৬)

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩—১৮৭০ খ্রীঃ)—ইনি জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ার তিতুরাম শিকদারের পুত্র। রাধানাথ হিন্দু কলেজের তীক্ষ্ণধী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি 'গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কম্পিউটার নিযুক্ত হ'ন। তিনি ডেপুটি কালেক্টার পদের জন্য প্রার্থী হইলে তাঁহার বিভাগীয় কর্ত্তা কর্ণেল এভারেষ্ট তাহাতে বাদী হন যেহেতু সার্ভে বিষয়ে তাঁহার মত উপযুক্ত ব্যক্তি বিলাতেও মেলে না। জরিপ বিভাগে কর্ম্মকালে রাধানাথের সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব 'এভারেষ্ট' আবিষ্কার। মেজর কেনেথ মেসন বলেন—"১৮৫২ খ্রীঃ একদিন একজন বাবু স্যার জর্জ্জ এভারেষ্টের পরবর্ত্তী সার্ভেয়ার-জেনারেল সার্ এণ্ড্রু ওয়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, মহাশয় আমি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছি"। পরে সার্ এণ্ড্রুর ইচ্ছা অনুসারে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম 'মাউন্ট এভারেষ্ট' দেওয়া হয়। রাধানাথ ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—(১৮৩৩—১৯০৪ খৃঃ)—হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এম্, ডি পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র ৺চন্দ্রকুমার দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, ডি পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি এককালে চিকিৎসা জগতে সমস্ত সম্মানীয়

পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে চিনিতে হইলে একটী ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। তিনি যখন কলিকাতার সেরিফ সেই সময় বর্ম্মা-বিজয়ী লর্ড ডফরিণের সম্মানার্থ তাঁহাকে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে অনেকে অনুরোধ করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলেন, "আমি শেরিফ, সাধারণের অনুরোধে আমাকে সভা আহ্বান করিতেই হইবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি লর্ড ডাফরিণকে বর্ম্মায় ডাকাতি করার জন্য কি প্রশংসাপত্র দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে?"

বাঙ্গালাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার অগ্রদূত ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল। ১৮৭৬ খৃঃ তিনি বহুবাজারে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান হইতে বহু ছাত্র পাথেয় ও বৃত্তি লইয়া বিদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়া জীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে। অর্থের অভাবে মহেন্দ্রলাল তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৯০২ সালে বহুবাজার বিজ্ঞান মন্দিরে তিনি যে শেষ বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, "যতটা আগ্রহসহকারে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছি তাহার অর্দ্ধেক উৎসাহ লইয়া যদি আমি স্বীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত থাকিতাম তাহা হইলে আমি নিজে এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে পারিতাম।" তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং উহাকে বিশেষ লোকপ্রিয় করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ধন্বন্তরীর ন্যায় তাঁহার যশঃলাভ হইয়াছিল।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসে সৌরীন্দ্র-মোহনের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার "সঙ্গীত সার সংগ্রহ" ভারত বিখ্যাত গ্রন্থ। হিন্দুসঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার কল্পে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। গীতবাদ্য বিষয়ক বহু পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করেন। ফিলাডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড হইতে তিনি "Doctor of Music" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী—বাঙ্গালীর উপনিবেশ পরিচ্ছদে ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হাজি মহম্মদ মহসীন—১৭৩০ খ্রীঃ মহম্মদ মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি স্বগৃহে বসিয়া সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী, পারসী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাঁহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তান ছিল একটী কন্যা, নাম মন্নু বেগম। মন্নুর পিতা আগা মোতাহার অগাধ ধনরত্ন ও বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর মন্নুর মাতা অল্পবিত্ত ফয়জুল্লাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ মহসীন এই বিবাহের সন্তান। মন্নু ও মহসীনের পিতা উভয়েই পারস্যদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতার অবর্ত্তমানে মহসীন ভগ্নীর অভিভাবক হ'ন। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে মির্জ্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ হয়। ভগ্নীর বিবাহের পর তিনি মক্কা, মদিনা, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি মুসলমান দেশ ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর মধ্যেই মন্নু বিধবা হইলেন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মন্নু পুনরায় মহসীনের শরণাপন্ন হইলেন। সম্পত্তির আয় তখন ৫০,০০০৲ টাকা হইবে। সংসারবিরাগী হইলেও মহসীনকে সে ভার লইতে হইল। ১৮০৩ খ্রীঃ মন্নু কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহসীনকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে বান্দা আলী খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি মন্নুর পোষ্যপুত্র বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিল এবং সম্পত্তির অধিকার দাবী করিয়া মহসীনের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিল। যাহা হউক, সে দাবী অগ্রাহ্য হইল।

মহসীনের হাতে অর্থ অনর্থের মূল হইল না। গরীব দুঃখী, আতুর, অন্ধ, হিন্দু মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। ১৮০৬ খ্রীঃ তিনি চরম দানপত্র দ্বারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবার উদ্দেশ্যে দান করিলেন। জমিদারী, হীরা-জহরৎ, সমস্তই

মস্‌জিদের ব্যয় ও বৃত্তি প্রভৃতির জন্য ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় উৎসর্গ করিলেন।

দুঃখের বিষয় মহসীনের নিয়োজিত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দাতার দান নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। অতএব ১৮১০ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হ'ন। শ্রাদ্ধ প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। এই গণ্ডগোলের মধ্যে মহসীনের সম্পত্তির আয় হইতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়। উহাতে মহসীন কলেজ স্থাপিত হয় ও ইমামবাড়ি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া মহসীনের সম্পত্তির আয় ৫০ হাজার হইতে দেড় লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। 'মহসীন ফণ্ড' হইতে বহু মুসলমান ছাত্র বৃত্তি পায়, অনেকগুলি মক্তব অর্থ সাহায্য পায় ও উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মুসলমান ছাত্ররা অর্থানুকুল্য লাভ করে। বাঙ্গালায় মুসলমান সমাজে মহসীনের তুল্য হিতৈষী ব্যক্তি কদাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। যাঁহারা সন্তান অভাবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, মহসীনের উদাহরণ তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে।

রামদুলাল সরকার—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমার 'রেকজনি' গ্রামের বলরাম সরকার বর্গীর ভয়ে যখন আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে পলাইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় বিজন অরণ্যসঙ্কুল পথিপার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন—তিনিই রামদুলাল। মাত্র আট বৎসর বয়সে রামদুলাল পিতৃমাতৃহীন হন। দুইটি ছোট ভাইএর হাত ধরিয়া তিনি পিতামহের আশ্রয় ল'ন। পিতা ছিলেন দরিদ্র, মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাস কলিকাতাবাসী হইলেও তাঁহার একমাত্র জীবিকার উপায় ছিল ভিক্ষা। একদিন গঙ্গাস্নানে আসিয়া হাটখোলার মহাধনী ও কারবারী মদনমোহন দত্তের স্ত্রী রামদুলালের মাতামহীর দুরবস্থার কথা শুনিলেন। দয়ার্দ্রচিত্তা দত্তগৃহিণী দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে রামদুলালের মাতামহীকে পাঁচ টাকা বেতনে পাচিকা নিযুক্ত করিলেন। দত্তবাবুদের প্রকাণ্ড সংসারে রামদুলালও ক্রমশঃ একটি স্থান করিয়া লইল। বাড়ীর ছেলেদের পুস্তক

অবসর মত পড়িয়া, লেখা কলাপাত ধুইয়া তাহাতে লিখিয়া ক্রমশঃ আপনার চেষ্টাতে রামদুলাল ষোল বৎসর বয়সে হাতের লেখায়, বাঙ্গালা পড়ায় ও অঙ্ক কষায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিল যে একদিন দত্ত মহাশয় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অফিসে শিক্ষানবীশ করিয়া দিলেন। একদিন ভয়ানক রৌদ্রে রামদুলাল বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না, অফিস কামাই করিল। দত্তমহাশয় সেদিন তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "বাপু, রৌদ্র ধূলার ভয় করিলে চাকুরি পাইবে কি করিয়া?" এই তিরস্কার রামদুলালের রক্ষা-কবচ হইল। দ্বিতীয়বার রামদুলালের আর পদস্খলন হয় নাই।

কিছুকাল পরে রামদুলাল পাঁচ টাকার মাহিনায় দত্তবাবুদের অফিসে বিল-সরকারী কাজ পাইল। তাঁহাকে পদব্রজে দমদমা, ব্যারাকপুর, টিটাগড় প্রভৃতি স্থানে কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষায় হাঁটিয়া বিল আদায় করিতে হইত। কিন্তু বালক মাহিনার পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া কাজ করিয়া চলিল। মাহিনার টাকা জমাইয়া যখন একশত হইল তখন টাকা বাড়াইবার আশায় বাগবাজারে এক কাঠের আড়তে রামদুলাল তাহা খাটাইতে দিলেন।

দত্তমহাশয় তাঁহার শ্রম-সহিষ্ণুতা দেখিয়া দশ টাকা মাহিনায় জাহাজ সরকারের কাজে বাহাল করিলেন। একাজে অনেক সময় গোরাদের কাছে সবুট লাথি খাইতে হইত, এবং নৌকা ডুবিয়া জীবননাশেরও আশঙ্কা ছিল। তথাপি কোন দিন রামদুলালকে কার্য্যে অবহেলা করিতে কেহ দেখে নাই। অক্লান্ত কর্ম্মলীপ্সা তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মে উপযুক্ত করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ তিনি ডুবোজাহাজের দর কষিতে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। সেকালে জাহাজও ডুবিত বেশী। একদিন তিনি হুগলীর মোহনায় একখানি ডুবো জাহাজের সংবাদ পাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি দর স্থির করিলেন। এ কাজে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি

তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে কোন কিছু কাণে আসিলে তাহার বিশদ অনুসন্ধান না করিয়া তৃপ্ত হইতেন না।

একদিন রামদুলাল তাঁহার প্রভুর কার্য্যে বহু অর্থ লইয়া "টুলার" নিলামে কতকগুলি দ্রব্য কিনিতে যান। কিন্তু তিনি বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় সে নিলাম পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। দুঃখিত চিত্তে যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন, সেই হুগলীর মোহনার ডুবো জাহাজখানি নিলামে উঠিবে। তিনি কৌতুহলী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিলাম ডাক আরম্ভ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে মূল্য তিনি ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহার সিকিমূল্যে জাহাজখানি বিক্রয় হইতেছে। তখন তিনি ১৪ হাজার টাকায় উহা কিনিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একজন সাহেব আসিয়া তাঁহাকে উহা বেচিতে অনুরোধ করিল। দর কষাকষি করিয়া ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকায় সাহেব উহা কিনিয়া লইল। রামদুলাল গৃহে ফিরিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃতি করিয়া সমুদয় অর্থ তাঁহার সম্মুখে রাখিল। যেমন কর্ম্মচারি, তাঁহার মনিবও তেমনি। উঁদার হৃদয় দত্ত মশায় নিজের ১৪ হাজার টাকা রাখিয়া লাভের একলক্ষ টাকা রামদুলালকে ফেরৎ দিলেন।

এই মূলধনই রামদুলালের উন্নতির সোপান হইল। ইহার পর হইতে "ধূলা মুঠা ধরিতে সোণা মুঠা" হইতে লাগিল। শীঘ্রই অনেক সম্ভ্রান্ত বণিক তাঁহাকে ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইল। যে কারবারের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইতেন তাহাতেই প্রভূত লাভ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। আমেরিকার বণিকেরা তাঁহাকে "জর্জ্জ ওয়াশিংটনে"র ছবি উপহার দিয়াছিল। মান্দ্রাজে দুভিক্ষ উপলক্ষে তিনি লক্ষ টাকা ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার কোন দিন স্পর্শ করে নাই। ক্রোঁরপতি হইলেও তিনি মদনমোহন দত্তের চাকুরি ত্যাগ করেন নাই। যখন প্রতি

মাসে তিনি বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তখন তিনি হাত পাতিয়া দত্তবাবুদের বাটী হইতে প্রতিমাসে ১০৲ টাকা হিসাবে মাহিনা লইয়া যাইতেন। ধন্য মনিব, ধন্য তাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী।

রামকমল, মতি শীল, সাগর দত্ত, বৈকুণ্ঠ গুঁই—মতি শীল আট টাকা বেতনে, রামতুলাল পাঁচ টাকা বেতনে ও রামকমল আট টাকা বেতনে জীবন আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকেই ব্যবসা দ্বারা ক্রোরপতি হইয়াছিলেন।

রামকমল 'এসিয়াটীক সোসাইটী'র অধীনে এক ছাপাখানায় আট টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সেখানে কেরাণীর পদে উন্নীত হ'ন। কেরাণী অবস্থায় উক্ত সোসাইটীর পুস্তকালয়ে অবসরকালে সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া এরূপ জ্ঞানার্জ্জন করেন যে সত্বরই টাকশালের দেওয়ানী পদে তুই হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হ'ন। তিনি একখানি সুবৃহৎ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। ইহারই পৌত্র হইতেছেন বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। রামকমল সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং তৎকালীন সকল দাতব্য অনুষ্ঠান সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাদরী মার্শমান তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন—"হেষ্টিংসের সমকালে দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানলোক বিস্তারে রামকমলের মত কেহ ছিল না।"

মতি শীল আট টাকা বেতনে কেরাণী জীবন আরম্ভ করিয়া পরে ব্যবসা দ্বারা ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ' ভারতের শিক্ষাজগতে অশ্রুতপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

ব্যারাকপুর যাইতে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপর যে বিশাল বাগান-বাড়ীতে সাগরদত্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল দেখা যায় উহা একজন স্বাবলম্বী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। পাটের ব্যবসায়ে তিনি বহু টাকা উপার্জ্জন করেন। সেকালে পাটের ব্যবসা বাঙ্গালীর হাতে ছিল, মাড়োয়ারী বা অন্য কোন জাতি পুরাদস্তুর উহা দখল করে নাই। সাগর দত্তের ন্যায় সাধু ব্যবসায়ী দেখা যাইত না। তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, রাত্রে যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ী

করিয়া গৃহে ফিরিতেন সকলেই বুঝিত রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, এবং আজকাল কেল্লার তোপের সহিত যেমন লোকে ঘড়ি মিলাইয়া লয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতিবেশীরা ঘড়ি মিলাইয়া লইত।

বঙ্গদেশের আর একজন বিখ্যাত ব্যবসাদারের ব্যবসা-জীবন আরম্ভের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ। একদিন গ্রীষ্মকালে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কটকে আসিয়া পৌঁছিলে একটি বালক আসিয়া তাঁহার নিকট একটি পয়সা চাহিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পয়সা লইয়া কি করিবে?" বালক বলিল, "মুড়ি কিনিয়া আমি কিছু খাইব, ও বাকী মার জন্য লইয়া যাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"যদি চারিটি পয়সা দিই?" বালক উত্তর করিল—"দুই পয়সায় আমি মুড়ি খাইব, দুই পয়সা মাকে দিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"যদি আট পয়সা দিই।" এবার বালক বলিল—"চার পয়সার মুড়ি কিনিয়া মা ও আমি খাইব, আর বাকী পয়সায় পাকা আম কিনিয়া তাহা বেচিয়া কিছু লাভ করিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন, এ উর্বর জমিতে ফসল ফলিবে। তিনি বালককে একটি টাকা দিলেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় কটক গিয়া দেখিলেন বালক একটি সুন্দর দোকান খুলিয়াছে। এই বালকটিই বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে ১৫০৲ মুলধন লইয়া কলিকাতায় একটি দোকান খুলেন। কালে তিনি বস্ত্রের কারখানা স্থাপন করেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত কাপড়ের নাম ছিল—মালদহ, খলিলি, সুরেষা, নবাবী, চিলমিথানা ইত্যাদি। বিদেশে—দক্ষিণ আফ্রিকা, এডেন, কায়রো প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতে—বোম্বাই, কালিকট, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত বস্ত্রাদি রপ্তানি হইত।

চিন্তামণি ঘোষ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মহেশ ভট্টাচার্য্য—চিন্তামণি ঘোষ তের বৎসর বয়সে ১০৲ টাকা মাহিনায় 'পাইওনিয়ার' সংবাদপত্রের ছাপাখানার চাকুরীতে জীবন আরম্ভ করেন।

ছেলেবেলা হইতে ব্যবসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া ব্যবসার দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়ে। চাকুরী অবস্থায়ই তিনি অংশীদার রূপে একটি কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি ২৫৲ পেন্সন লইয়া স্বাধীনভাবে ছাপাখানার কার্য্য আরম্ভ করেন। আজ এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়ান প্রেস" ভারতবর্ষ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম মুদ্রাযন্ত্র। হাজার হাজার লোক আজ এই প্রেসে কাজ করিতেছে এবং ইহার শাখা-প্রশাখা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়াছে।

গুরুদাস একদিন মাত্র চারি-আনা মূলধন লইয়া কলিকাতার রাস্তায় পঞ্জিকা বিক্রয় করিয়া জীবন আরম্ভ করেন। কালে তিনিই বাঙ্গলার কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকগণের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির কারণ তাঁহার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য। দরিদ্র অথচ শক্তিমান লেখকদের তিনিই সাধারণ্যে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। 'গুরুদাস লাইব্রেরী' বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান। ইঁহারাই "ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্রের প্রকাশক।

মহেশচন্দ্র একজন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি। তাঁহার অধ্যবসায়, সততা ও কর্ম্মশক্তি আদর্শস্থানীয়। 'বটকৃষ্ট পাল' কোম্পানীর পর তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔষধ বিক্রেতা। তিনি অল্প দামের হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-গ্রন্থ এদেশে বহুল প্রচার করিয়া গরীব বাঙ্গালীর যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অধ্যবসায়গুণে সহায়সম্পদ্‌হীন দুঃস্থ ব্যক্তি দেশ ও সমাজের কত উপকার করিতে পারেন, মহেশচন্দ্র তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বটকৃষ্ণ পাল, স্যার্‌ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বটকৃষ্ণ পাল পাটের গদিতে চাকুরী করিবার কালে একবার নৌকাডুবি হইয়া জীবনান্ত হইতে অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ছয় টাকা মাহিনায় একটি মশলার দোকানে চাকুরী করেন। ক্রমে নিজে ঔষধের দোকান খোলেন।

পুরাতন ঔষধ তিনি বিক্রয় না করিয়া ফেলিয়া দিতেন, তথাপি খরিদ্দারকে বেচিতেন না। ফলে তাঁহার এরূপ সুনাম হয় যে কালে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তাঁহার ঔষধের দোকান ও কারখানা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাঁহারই পুত্র হরিশঙ্কর পাল সরকার হইতে স্যার্ উপাধি পাইয়াছেন ও কলিকাতার মেয়র পদেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি—২৪ পরগণার ভ্যাব্‌লা গ্রামে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণবংশে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি সেকালের ব্যবস্থামত প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি পাঠ্যাবস্থায় অর্থাভাবে ভবানীপুর বেলতলা হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে হাঁটিয়া পড়িতে যাইতেন। তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় আলীপুর চিড়িয়াখানার বাগানে। একদিন তিনি উক্ত বাগানের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট বন্ধুবর রামব্রহ্ম সান্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন একটা সাঁকো তৈয়ারী লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। এক সাহেব রাজমিস্ত্রীকে কিছুতেই কাজ বুঝাইতে পারিতেছেন না। রাজেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মিস্ত্রীকে সাহেবের বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব খুশী হইয়া তাঁহাকে একখানি কার্ড দিয়া দেখা করিতে বলিলেন। এ সাহেব আর কেহ নহেন, ব্র্যাডফোর্ড লেস্‌লী—কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। এই পরিচয়ই রাজেন্দ্রনাথের উন্নতির সোপান হইল। পলতায় জলের কলে তিনি কণ্ট্রাক্ট পাইলেন। এ সময় সামান্য এক হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে লভ্যাংশের অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হইয়াছিল। পরে বহুদিন তাঁহাকে লভ্যাংশ ও সুদ দুইই দিবার অঙ্গীকারে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। পলতার জলের কল, কলিকাতার জলের কলের পাইপ বসানো, হুগলির আদালত বাড়ী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মে তিনি মান ও অর্থ দুইই লাভ করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হইলে ২৬ বৎসর বয়সে যাদুমণি দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি

১৮৯২ সালে মার্টিনের সহিত ভাগে 'মার্টিন কোম্পানী' গঠন করেন। অল্পদিনেই মার্টিন কোম্পানীর নাম ভারতবিখ্যাত হইয়া পড়িল। জীবনের অপরাহ্নে তিনিই ছিলেন মার্টিন কোম্পানী, বার্ণ কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমস্ত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কমিটী-কমিশন প্রভৃতিতে তিনি সভ্য ও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার উপাধিগুলি দেখিলে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, কে-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও, ডি-এস-সি, এম্-আই-ই, এম্-আই-এম্-ই, এফ-এ-এস্-বি।

৮২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ দেখিতেন। দেশের ও স্বগ্রামের কথা তিনি কখন ভুলেন নাই। কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহার স্নেহ পুত্রোপম ছিল।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—গরীবের সন্তান হইয়া মেধা ও বুদ্ধিবলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলার। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সে যুগে তাঁহার আদর্শ জীবন বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা আনিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচন ও নিয়মাবলী প্রণয়নে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—তিনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। দেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটী চাকুরী গ্রহণ করেন। এই চাকুরীর সময়েই তাঁহার বিখ্যাত নাটকগুলি লিখিত হয়। "দুর্গাদাস", "মেবার পতন", "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটক তাঁহার অমর দান।

তিনি হাস্যরসিক ছিলেন। তাঁহার হাসির গান তুলনাবিহীন। যতদিন বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার "বঙ্গ আমার জননী আমার", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে", "জননী, বঙ্গভাষা আমি এ জীবনে", "ভারত আমার ভারত আমার" প্রভৃতি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহারই সম্পাদনায় "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্র প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়, কিন্তু পত্রিকাখানি বাহির হইবার পূর্ব্বেই ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ—বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে মুন্সেফী চাকুরীর জন্য একদিন যিনি লালায়িত ছিলেন, উত্তরকালে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া গণ্য হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম Advocate General হন ও বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রথম 'ভারতীয় ল' মেম্বর' পদ লাভ করেন। তিনি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। মহাযুদ্ধের অবসানের পর ফ্রান্সের ভার্সেই নগরে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। তিনিই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ ভারতীয় যিনি "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি "সহকারী ভারত সচিবের" পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি স্থায়ীভাবে প্রাদেশিক লাট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'বিহার ও উড়িষ্যার' লাট পদ প্রাপ্ত হ'ন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রাম তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ, মাতার নাম নিস্তারিণী। ভুবনমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ বি-এ, পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে তিনি অসংখ্যবার প্রকাশ্য

সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ দেশে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে ঋণদায়ে তাঁহার পিতা দেউলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একটি অভিনব কাজ করিলেন। সমস্ত মহাজনের খতে নিজ নাম দস্তখত করিয়া পিতার সহিত তিনি দেউলিয়া নাম কিনিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ তিনি বাসন্তীদেবীকে বিবাহ করেন। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া তিনি কঠোর অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে অল্পে অল্পে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন। তারপর ১৯০৯ সালে আসিল আলিপুরের যুগান্তকারী বোমার মামলা—ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যধ্বংসের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিলেন। মাসের পর মাস মকদ্দমা চলিল, নর্টন সাহেব গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ব্যবহারজীবি দাঁড়াইয়াছিলেন। এই মকদ্দমায় চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার সম্যক উন্মেষ হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল শ্রম সার্থক হইল। অরবিন্দ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া বেকসুর খালাস পাইলেন। এইরূপ সঙ্গীন মকদ্দমায় জয়লাভ হওয়ায় তাঁহার যশ দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, মক্কেলে তাঁহার ঘর ভরিয়া উঠিল। অরবিন্দের মকদ্দমায় ও ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের আগমনে তাঁহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইল না। পিতৃঋণের কথা তিনি ভুলিলেন না। মহাজনদের ডাকিয়া নিজ উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কড়ায় গণ্ডায় ৬৪ হাজার টাকা গনিয়া দিলেন। বিচারপতি জজ ফ্লেচার সাহেব মুক্তিপত্রের রায়ে লিখিয়াছিলেন—"এমন অযাচিতভাবে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া নাম ঘুচাইবার চেষ্টা আমি আর কখন দেখি নাই।" চিত্তরঞ্জনের এই কীর্ত্তি সমগ্র দেশের চিত্ত রঞ্জন করিল।

এই সময়ে তাঁহার মাসিক আয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকায় উঠিল। তাঁহার দানও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। কেবল শত সহস্র টাকা

দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই। চাঁদপুরের শ্রমিক বিভ্রাটকালে স্টীমার-ধর্ম্মঘট হওয়ায় পদ্মার ভীষণ বাত্যাহত বক্ষে ক্ষুদ্র নৌকায় চাপিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর যান। ১৯০৫ খ্রীঃ হইতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবসা ত্যাগ করেন। রাজা ফকির সাজিলেন। ইহার পর ১৯২১ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হ'ন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নেতৃত্বকালে তিনি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা বারম্বার ভাঙ্গিয়া দেন। কলিকাতা মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং দার্জ্জিলিং প্রবাসে হঠাৎ ইহলীলা সম্বরণ করেন। সাহিত্য জগতেও তাঁহান দান অকিঞ্চিৎকর নহে। তাঁহার "সাগর-সঙ্গীত" বাঙ্গালীর শ্লাঘার জিনিষ। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার শব-শোভাযাত্রা ভারতে কেন, জগতে অতুল। এরূপ মর্ম্মান্তিক শোকোচ্ছ্বাস কেহ কখনও শুনে নাই, দেখে নাই। মহাত্মা গান্ধী সেই শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ— গিরীশচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালার নাট্যশালার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ভরতমুনির প্রণীত ভারত-নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায়। ইহা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত। ইহাতে দেখা যায় নাটকের প্রবৃত্তি ছিল চারি রকম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "ওড্রমাগধী যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ষক, ব্রহ্মোত্তর,

ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাসিত; স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় আদৌ ভালবাসিত না; গান, বাজনা, নাচ—এসব ভালবাসিত না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অমৃতলাল বসুর মুখে শুনিতে পাই, এখন ও বাঙ্গালীরা নাচ গান তত পছন্দ করে না।"

আমাদের দেশে যেমন প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছেন মিশনারী কেরী, তেমনি প্রথম বাঙ্গালী অভিনেতা লইয়া প্রথম নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন হেরেসাম লেবেডেক নামক একজন শ্বেতাঙ্গ (১৭৯৫ খ্রীঃ)। কিন্তু এ অভিনয় ইংরাজিতে হয়। ইহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে (১৮১৭ খ্রীঃ) ডিরোজিওর ছাত্রগণ নাট্যাভিনয় লোকপ্রিয় করেন। কিন্তু তাহাও ইংরাজীতে।

১৮৩৫ খ্রীঃ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে প্রথম স্ত্রী অভিনেতা লইয়া অভিনয় হইয়াছিল। পরে সিমলার ছাতু বাবুর বাড়ী, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটী, ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতিতে অভিনয় আরম্ভ হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্ম প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ও অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় চুঁচুড়ায় "লীলাবতির" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হওয়ায়, উহার প্রতিযোগিতায় কলিকাতা সহরে গিরীশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমৃতলাল প্রমুখ অভিনেতাগণ "লীলাবতী" অভিনয় করিলেন। এই অভিনয়ের এরূপ সুখ্যাতি হইল যে নাট্যামোদীরা ১৮৭২ খ্রীঃ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ খুলিতে সাহস করিলেন। কিন্তু উহার নাম লইয়া গিরীশচন্দ্রের সহিত অপরাপরের বিচ্ছেদ হইল। "ন্যাশানাল থিয়েটার" নাম ঠিক হওয়ায় গিরীশ বাবু বলিলেন, "যে থিয়েটারের পোষাক নাই, ষ্টেজ নাই, অর্থ নাই তাহাকে জাতির মুখপাত্র করিয়া দাঁড় করাইতে আমি কিছুতেই রাজী নহি।" এই মনোভাবে আমরা গিরীশ বাবুর সঠিক পরিচয় পাই।

তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতাও ন'ন, নট হিসাবে তিনি অর্দ্ধেন্দুর সমকক্ষও ছিলেন না। তথাপি তিনি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের জনক বলিয়া পরিচিত। ইহার কারণ তাঁহার লিখিত নাটক না পাইলে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। অতীতের কোন আদর্শের সাহায্য না পাইলেও গিরীশচন্দ্র রঙ্গালয়ের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা একেবারেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন নহে। তিনি সর্ব্বদা উচ্চ নৈতিক আদর্শ স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বলিতেন— "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী শাসিত হয়। নীতি শিক্ষা, রাজনীতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চের কার্য্য দেশের কার্য্য।" তাঁহার "বিল্বমঙ্গল", "চৈতন্য-লীলা", "প্রফুল্ল", "শঙ্করাচার্য্য" প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যেই লিখিত। পুরাণাদির গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ-চিত্রগুলি তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সামাজিক নাটকগুলিতে বাঙ্গালীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদনের অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভার ও দেশপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ পাই। তাঁহার নাটকের ভাষা ও ছন্দ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সুখপাঠ্য। তাঁহার ইংরাজী নাটক অনুবাদ করিবার শক্তি ছিল অসন্যসাধারণ। তিনি পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ অপেক্ষা তাঁহাকে কম ভালবাসিতেন না।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—১৮৭১ খ্রীঃ আশুতোষ বাঙ্গালীর এক শুভ মুহূর্ত্তে দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন উদার হৃদয় বিখ্যাত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ। পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন লইতেন। আশুতোষ এফ, এ হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশুতোষ ২৫ বৎসর বয়সে রাসবিহারী ঘোষের আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়া হাইকোর্টে যোগ দেন। ঐ সময়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি সিনেটের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে ভারতীয় ইউনিভারসিটি

কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৭ সালে "স্যাড্‌লার কমিশনের"ও তিনি সভ্য ছিলেন। তিনি ওকালতি করিবার সময় অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা করিয়া কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি হাইকোর্টের জজ হ'ন। তিনি দশ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ছিলেন ও তিনবার এসিয়াটীক সোসাইটীর সভাপতি হ'ন। লাট লিটনের নিকট তাঁহার লিখিত পত্র এক মাত্র বঙ্গ-শার্দ্দূল তেজস্বী আশুতোষেই সম্ভবে। হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ডুমরাঁও রাজার মোকদ্দমা চালাইতে গিয়া পাটনাতে হঠাৎ তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

মানুষ হিসাবে তিনি বোধ হয় আরও বড় ছিলেন। মাতার আদেশে তিনি লর্ড কার্জ্জনের দ্বারা বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতাও কম তেজস্বিনী ছিলেন না। আশুতোষ যখন হাইকোর্টের জজ হওয়ার সংবাদ মাতাকে দিলেন, উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "চাকুরী যত বড়ই হউক, গোলামী ছাড়া আর কি?" আশুতোষ অত্যন্ত সন্তানবৎসল ছিলেন। স্নেহের কন্যা কমলার অকাল বৈধব্য তাঁহাকে মর্ম্মাহত করে। আত্মীয়গণের অনুরোধ উপরোধ, সমাজের ভ্রুকুটী, আচার ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সকলই উপেক্ষা করিয়া তিনি বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট বান্ধবের স্নেহ পাইত, আশ্রয়হীন বিদ্বন্মণ্ডলী অযাচিত সাহায্য পাইত, অধিনস্থ কর্ম্মচারীরা অফুরন্ত সহানুভূতি পাইত। বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নির্ভিক রসপ্রিয় পুরুষসিংহ আশুতোষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। স্যাড্‌লার কমিশন উপলক্ষে একদা তিনি ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি ষ্টেশনে তাঁহার কামরায় একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারীসাহেব উঠিয়া দেখিলেন তিনি নাগরা জুতা খুলিয়া রাখিয়া ঝিমাইতেছেন। ধৈর্য্যচ্যুত সাহেব তাঁহার জুতা জোড়াটী জানালা দিয়া চলন্ত ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিয়া হুকের গায় নিজের কোট খুলিয়া আসনে শুইয়া পড়িলেন। আশুতোষ কোন বাদ প্রতিবাদ না করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া সাহেবের জামা,

যাহাতে টাকা, পয়সা, টিকিট প্রভৃতি ছিল, জানালা গলাইয়া চলন্ত ট্রেন হইতে ফেলিয়া দিলেন। সাহেব তখন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কোটটি কি করিলে?" উত্তরে আশুতোষ বলিলেন, "কোটটিকে আমার নাগরা জুতা আনিতে পাঠাইয়াছি"। আশুতোষের সোপাধি নাম ছিল "অনারেবল জষ্টিস্ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে-টি, এম্-এ, পি-আর-এস্, ডি-এল্, ডি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ-এস্, এফ-আর-এস্, এস-ই, সি-আই-ই, ডি-লিট্, সি-আই-ই, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী।

আশুতোষ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন দুইটি কারণে—বঙ্গভাষার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য, এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য। এই দুইটি বিষয়ে ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শনে আজ সারা ভারতবর্ষে সেই নীতি অবলম্বিত হইতেছে।

রাসবিহারী ঘোষ ও তারক পালিত—রাসবিহারী ঘোষ, ডি-এল্ (১৮৪৫-১৯২১) বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার তুল্য আইনজ্ঞ ভারতবর্ষে কখনও জন্মায় নাই। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে বহুলক্ষ টাকা মূল্যের (আনুমানিক ১৮ লক্ষ টাকা) সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

তারকনাথ বিখ্যাত ব্যরিষ্টার ছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি (আনুমাণিক মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা) সায়েন্স কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু—জগদীশের পিতা ভগবান্‌চন্দ্র দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হাকিম ছিলেন। জগদীশের বাল্যকালে জেল-প্রত্যাবৃত্ত এক নামজাদা ডাকাত পূর্ব্ব পেষা ত্যাগ করিবার অঙ্গীকারে তাঁহাদের গৃহে পরিচারক নিযুক্ত হয়। তাহার নিকট জগদীশ ডাকাতদের নানাপ্রকার বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতেন। বাল্যকালে তিনি যাত্রা কথকথা বড় ভালবাসিতেন।

১৮৮০ সালে যখন বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া মহামারী দেখা দেয় তখন ভগবান্‌চন্দ্র ছিলেন সেখানকার সরকারী কমিশনার। ছাত্রহিসাবে জগদীশ খুব মেধাবী ছিলেন না। কেম্ব্রিজে ট্রাইপস্ পাশ করিয়া ও লণ্ডনে ডি-এস্-সি উপাধি লইয়া চারিবৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। জগদীশের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকুরী পান। তাঁহার মৌলিক গবেষণা ও প্রবন্ধাদির জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস্-সি উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেন। পুনরায় ১৯০০ সালে প্যারি আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া যে একই ভাবে সম্পাদিত হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি স্যার্ উপাধি পান। ১৯১৭ সালে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে—"ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন করিলাম।" এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক ২০ বৎসর পরে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের দেশ প্রেমিক ও বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য বাহির করেন, তাহাই জগতে বিনা-তারের বার্ত্তা প্রেরণের সূচনা করে। "১৮৯৪ খৃঃ নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যের দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছে তাঁহার সেন্ট জেভিয়ার কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অধ্যাপক পেড্‌লারের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৌঁছিয়া একটী পিস্তল ছুঁড়িল।" এই আবিষ্কার কাহিনী জগতে প্রচারিত হইল। মার্কনি প্রবর্ত্তিত যন্ত্র ইহার পরে দেখা দিয়াছে। জগদীশচন্দ্র যদি মার্কনির ন্যায় তাঁহার যন্ত্রের পেটেণ্ট লইতেন তাহা হইলে বহু লক্ষ টাকা আয় করিতে পারিতেন।

তিনি জগতের জ্ঞান বিস্তারের জন্য গবেষণা করিয়াছেন, অর্থের জন্য নয়। বহু-ক্রোরপতি এক জাহাজের অধ্যক্ষকে তিনি ঐ প্রকার যুক্তি দেখাইয়া পেটেণ্ট লইবার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন।

তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক জীবনে কি আশ্চর্য্যজনক ঐক্য রহিয়াছে ইহা যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ও মতিলাল—ঘোষ ভ্রাতাদ্বয়ের জীবনী বলিতে গেলে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র কথা বলিতে হয়। যশোহরের একটি অপরিজ্ঞাত পল্লী ঘোষ ভ্রাতাগণের বাসভূমি। তিন শত টাকা মূলধন লইয়া শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া একটি প্রেস ও উহার সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন এবং গ্রামে কম্পোজিটার মেলা অসম্ভব বলিয়া নিজেই সে কার্য্য শিক্ষা করিয়া লন। ১৮৬৮ খ্রীঃ "অমৃতবাজার পত্রিকা" বাহির হয়। চারি বৎসর পর ইহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই ইহা তখন প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন যখন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিতে অগ্রসর হন, তখন "পত্রিকা" ইংরাজীতে প্রকাশিত হইল। একদা বাঙ্গালার ছোটলাট স্যার এ্যাস্‌লি ইডেন শিশিরকুমারের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটি আপোষ বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন, উত্তরে শিশিরকুমার উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, "আপনার কি ইচ্ছা, দেশে একজনও স্বাধীন ও সাধু সংবাদপত্র সম্পাদক থাকিবে না"। ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন, গায়কোবাড় ও রেওয়ার মহারাণীর সিংহাসনচ্যুতি কাশ্মীর গিলগিট রহস্যভেদ ও কাশ্মীর মহারাজের পুনঃ সিংহাসন প্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারে "পত্রিকা"য় আন্দোলন চিরস্মরণীয় থাকিবে। ১৮৯১ খ্রীঃ পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বাহির হয়। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ৪০০ খানি দৈনিক "পত্রিকার" প্রকাশ যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত, আর আজ প্রতি মিনিটে ৪০০ খানি করিয়া "পত্রিকা" ছাপা হইয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত হইলেও পর্য্যাপ্ত মনে হয় না। শিশিরকুমার পরিণত বয়সে একান্ত বৈষ্ণবভাবাপন্ন হন এবং

অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মতিলাল জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "পত্রিকা"র লোকপ্রিয়তা বর্দ্ধন করেন। আজ "পত্রিকা"র কলিকাতা ও এলাহাবাদ হইতে দুইটি পৃথক সংস্করণ বাহির হইতেছে। এক "ষ্টেটস্‌ম্যান্" ছাড়া কোন দেশী বা বিদেশী পত্রিকা এ সম্মানের অধিকারী নহে।

যতীন্দ্রমোহন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও কিশোরীপতি রায়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যে কয়জন ত্যাগী বাঙ্গালী দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও সাতকড়িপতি রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর যতীন্দ্রমোহন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া "ত্রি-মুকুট" অধিকারী হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রপদ, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের নেতৃপদ তিনি প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার সময় হইতে বঙ্গীয় কংগ্রেস মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে বাঙ্গালার উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

শাসমল মহাশয় মেদিনীপুর জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর সহিত অনেক সময় তাঁহার মতানৈক্য দেখা গিয়াছে। তিনি নির্ভিক, দৃঢ়চেতা, অক্লান্তকর্ম্মী দেশসেবক ছিলেন। দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাঙ্গালার ত্যাগী পুরুষ দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট সাতকড়ি রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীপতি রায় মেদিনীপুর জেলার একজন নিরলস দেশসেবক ছিলেন। হৃদয়ের মাধুর্য্যে, ত্যাগের মহিমায়, অক্লান্ত দেশসেবায় ও রাজরোষবরণ দ্বারা তিনি মেদিনীপুরবাসীর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। জাতীয়তাবাদ তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। মনে প্রাণে তিনি মহাত্মাজীর "অহিংস ধর্ম্মে" বিশ্বাসী ছিলেন।

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—খুলনা জেলার কপোতাক্ষ তীরে রাড়ুলি কাটিপাড়া নামক গ্রামে তিনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই

কপোতাক্ষের অপর তীরে মধুসূদনের জন্ম-নিকেতন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার মোহে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ পাশ করেন। বি, এ, পড়িতে পড়িতে "গিলক্রাইষ্ট" বৃত্তিলাভ করিয়া এডিনবরাতে বিজ্ঞান পড়িতে যান। বিলাতে ডি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৮৮৯ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি মারকিউরাস্ নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্" তাঁহার অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি। চিরকুমার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পরহিতে ও দেশসেবায় আত্মদান করিয়াছেন। তিনি ছাত্রগণের পরম বন্ধু ও হিতকারী।

ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—ইনি সাধারণ্যে জে,চৌধুরী নামে খ্যাত। পাবনার হরিপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। বঙ্গের তথা ভারতের আঁইনজীবিদের মধ্যে চৌধুরী ভ্রাতারা সর্ব্বজনবিদিত। হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত জজ স্বর্গীয় এ, চৌধুরী, বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পি, চৌধুরী (বীরবল), ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরী, কর্ণেল এম্, এন্, চৌধুরী প্রভৃতি যোগেশচন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা। ভদ্রতায়, সৌজন্যে, অমায়িকতায়, এক কথায় 'gentleman' বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই ইঁহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব। যোগেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম জামাতা। প্রথম যৌবনেই তিনি বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালার যুবকগণের মুখে সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার নাম সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত। বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি গণ্যমান্য সভ্য ছিলেন এবং অর্থনীতি, সামরিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ ভারত সরকার অনেক সময় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

বাট্যার হার সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমানে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর লইলেও এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতার রিপন কলেজের ন্যায় সুবৃহৎ শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ সভার গুরু দায়িত্বপূর্ণ সভাপতিপদে আসীন আছেন।

জাতীয় জীবনে তাঁহার দুইটি বিশিষ্ট দান হইতেছে কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনের সহিত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন প্রবর্ত্তন এবং ভারত বিখ্যাত "কলিকাতা উইক্‌লি নোটস্"এর প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু সম্পাদন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতা কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনের অঙ্গরূপে প্রথমবার শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই দেশজ শিল্পের ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা যে জাতীয় জীবনের পরিপোষক তাহা কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়া এই বৎসর হইতে কংগ্রেসের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত স্থির করিলেন। এই প্রদর্শনীর প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করেন ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এই প্রদর্শনীই পরবর্ত্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূত। তাঁহার স্থাপিত "ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্"ই স্বদেশী আন্দোলনের কল্পনা জাগ্রত করে। যোগেশচন্দ্রের "কলিকাতা উইক্‌লী নোটস্" আইনজীবি মহলে বড়ই প্রয়োজনীয় ও আদরের সামগ্রী। এই পুস্তিকাখানি গৃহে পৌঁছিলে কোন পাঠক তাহার আদ্যান্ত একবার চোখ্ না বুলাইয়া থাকিতে পারেন না। এখনও তিনি নিয়মিত "উইক্‌লি নোটস্" আফিসের কার্য্য পরিদর্শন করেন। বার্দ্ধক্যে আদরিণী কন্যা ও কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল বিয়োগে শোকাহত স্নেহকোমল হৃদয় কর্ম্ম কোলাহলেই শান্তিলাভ করিতেছে। তিনি কিছুকাল কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ—১৮৭২ সালে কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। ৺রাজনারায়ণ বসু ইহার মাতামহ। বিলাতী আদর্শে শিক্ষিত হইবার নিমিত্ত মাত্র সাত বৎসর বয়সে ইহার পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষ (I.M.S.) ইহাকে

বিলাত প্রেরণ করেন। সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করিলেও অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় চাকুরী পা'ন না। পরে কেম্ব্রিজ হইতে "ক্লাসিক্যাল ট্রাইপজে" প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ন। যখন তিনি বরদা কলেজে ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" জন্য বাঙ্গালা দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্বদেশপ্রেমিক ত্যাগী অরবিন্দ বঙ্গমাতার আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বরদার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। "ন্যাশানাল কলেজ" স্থাপিত হইলে তিনি উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন ও "বন্দে মাতরম্" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। ১৯০৮ সালে বিপ্লববাদীদিগের সহিত তিনি "আলিপুর বোমার মামলা" নামক ইতিহাস-বিখ্যাত মোকদ্দমায় জড়িত হ'ন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের আপ্রাণ চেষ্টায় নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। পরে তিনি ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে গিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার আশ্রমের খ্যাতি সুদূর য়ুরোপ ও আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত বর্ত্তমান জগতে আর কেহ নাই। "আর্য্য" নামক একখানি ইংরাজী দার্শনিক পত্র তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হইতেছে। সম্বৎসরে মাত্র একদিন তাঁহার ভক্তদিগকে তিনি দর্শন দেন। বঙ্গজননী এই মহামানবকে গর্ভে ধারণ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন।

ডাঃ স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—১৮৭৫ সালে জামালপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খৃঃ তিনি রসায়নশাস্ত্রে এম্, এ, পাশ করেন ও ১৮৯৮ খৃঃ এম্, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে বহু পারিতোষিক ও পদক পুরস্কার পান। তিনি কুড়ি বৎসর ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের মেডিসিনের শিক্ষক ছিলেন। এই সময় তিনি ইউরিয়া-ষ্টিবামিন নামক কালা-জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া জগতে কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। এককালে কালা-জ্বর অবধারিত মৃত্যুর কারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত

ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে জীবন লাভ করিতেছে।

স্যার আব্‌দার রহিম—ইনি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া মান্দ্রাজ হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং পরে উহার অন্যতম বিচারপতির আসন লাভ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করেন। বাঙ্গালাদেশে "সর্ব্বাত্যল্পকালের মন্ত্রিত্বের" জন্য তাঁহার কার্য্যকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি শাসন পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি।

খাঁ বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক্—আজিজুল হক্ সাহেব শান্তিপুরের অধিবাসী। তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রীও হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বিলাতে "ভারতের হাই-কমিশনারের" সম্মানীয় পদলাভ করেন। এক্ষণে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের "বাণিজ্য-বিভাগের" মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বহু সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি। তাঁহার ন্যায় অল্পবয়সে এতগুলি সম্মানীয় ও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ অতি অল্প ভারতীয়ই অধিকার করিয়াছেন।

রাইট্ অনারেবল স্যার সৈয়দ আমির আলি—১৮৪৯ খ্রীঃ চুঁচুড়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। তাঁহার "হিষ্ট্রি অফ্ দি স্যারাসেন্‌স্" একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া প্রথম চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে হাইকোর্টের জজ এবং অবশেষে প্রিভি-কাউন্সিলার হ'ন। তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রিভি-কাউন্সিলার।

মৌলভী ফজলুল হক্--ইনি বরিশালবাসী। কলিকাতায় হাইকোর্ট ব্যববারজীবি হিসাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি বাগ্মী,

দাতা। ইনি কলিকাতার মেয়র হন। ১৯৩৬ সালের ভারতীয় রাষ্ট্র আইন দ্বারা গঠিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ইনিই প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দেশবরেণ্য আশুতোষের মধ্যম পুত্র শ্যামাপ্রসাদ পিতার পদাঙ্কানুসরণে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার চরম কর্ম্মস্থল ঠিক করিয়া লইয়াছেন। লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইতে চাহিলেও তিনি সরস্বতীর ঐকান্তিক সেবায় আত্মদান করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র জগতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ বয়সে ভাইস্‌চ্যান্সেলার পদ প্রাপ্ত হ'ন। চারি বৎসর তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার যশ স্থাপন করিয়াছে। তিনি সদ্‌ভাষী, সৌম্য প্রকৃতি, বন্ধুবৎসল ও উদার হৃদয়। কর্ম্মী হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয়। তাঁহার নিরহঙ্কার প্রকৃতি, ধীর স্বভাব, অসাধারণ কার্য্যকুশলতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা তাঁহাকে আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে। তিনি অজাতশত্রু। তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দানের সময় লাটসাহেব লর্ড ব্র্যাবোর্ণ সত্যই বলিয়াছেন, "তিনি মহামতি পিতার উপযুক্ততম পুত্র বলিয়াই শুধু পরিচিত নহেন। তিনি নিজের গৌরবেই আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।" বর্ত্তমানে তিনি নিখিলভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি।

তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। শুধু এই জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন। আজ তাঁহারই আদর্শ অন্যান্য প্রদেশে দ্রুত অনুসৃত হইতেছে। বেকার শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য সরকারি ও বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগীতায় তিনি Appointment Board প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই বোর্ডের চেষ্টায় ধুরন্ধর ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি হক্ সাহেবের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় অর্থসচিব পদ গ্রহণ করেন কিন্তু সরকারী নীতির সহিত একমত না হওয়ায় পদত্যাগ করেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অধ্যক্ষ

প্রমথনাথ তাঁহার অন্তরঙ্গ ও প্রধান সহকর্ম্মী। দ্বিতীয় হক্ মন্ত্রীসভার সভ্যরূপে তিনি আপামর সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হন।

কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষালয়ে কখনও যান নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষালব্ধ কোন উপাধিও অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গান, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি সমগ্র জগতে আদৃত হইয়াছে। তাঁহার "গীতাঞ্জলী" নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছে। শান্তি নিকেতনে তিনি আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জগতের কৃষ্টি-সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ উৎসুক। তাঁহার চিন্তাশক্তি, ভাবুকতা, দেশপ্রেম, রাজনীতিজ্ঞান অনন্যসাধারণ। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ভক্তিভাজন গুরুদেব। তিনি বাঙ্গালীর তথা ভারত ও ভারতবাসীর গৌরব।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী দেবানন্দপুরে মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁহার জন্ম। এফ-এ, পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইস্তফা দেন। ভাগলপুর হইতে কলিকাতা, সেখান হইতে বর্মায় গিয়া একটি অস্থায়ী চাকুরী করিবার সময় "ভারতী" পত্রিকায় লিখিত তাঁহার উপন্যাস হঠাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্পদিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও সাহিত্য সেবায় অবহিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' পদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি দেন। তিনি প্রায় চল্লিশ খানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বহি রচনা করিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত সজীব ছবি অঙ্কন করা। তিনি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রগুলি দোষে গুণে এমন প্রকার মানুষ যাহাদের আমরা বাস্তব জীবনে প্রত্যহ আশে পাশে দেখিতে পাই। তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তা ও মানুষের প্রতি বিস্তীর্ণ সহানুভূতি প্রত্যেক উপন্যাসে দেখিতে

পাওয়া যায়। শিশুর সারল্য ও অনাবিল হাস্য যে তাঁহার হৃদয়কে মোহিত করিত, তাঁহার উপন্যাসে সেই ইঙ্গিত আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাই। তাঁহার অনবদ্য গদ্য বঙ্গ সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। কথাশিল্পী হিসাবে তিনি অপরাজেয়। মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

হরিনাথ দে ও আচার্য্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ—হরিনাথ ৩৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮টি ভাষায় এম্, এ পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম ও একমাত্র বাঙ্গালী লাইব্রেরিয়ান। চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ টাকা স্কলারসিপ্ পাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এ যুগে সকল শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ়জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মায় নাই। এক সপ্তাহ তাঁহার সহিত যে কোন বিষয়ে আলাপ করিলে যে জ্ঞান লাভ হইত তাহাতে অক্লেশেই সে বিষয়ে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করা যাইত। তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। পরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ভাইস্-চ্যান্সেলার ও মহীশূর রাজ্যের শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত হ'ন। স্যার মাইকেল স্যাড্লার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি চিরদিন তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিব"। "সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ" আখ্যার একমাত্র তিনিই উপযুক্ত পাত্র। ১৯৩৮ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র বসু—(জন্ম ১৮৯৭) ইনি কটকের বিখ্যাত ব্যবহারজীবি জানকীনাথ বসুর পুত্র। ১৯২০ খ্রীঃ সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে উক্তকর্ম্মে ইস্তফা দিয়া দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই কাটাইয়াছেন এবং কঠিন যক্ষ্মাব্যাধিতে

একাধিকবার আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুদ্বারে উপনীত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার দেশসেবাব্রতে কোনদিন কোনপ্রকারের শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও পরে "মেয়রের" সম্মানিত পদে নির্ব্বাচিত হ'ন। "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে"র তিনি একাধিকবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি বামপন্থী বলিয়া দক্ষিণ-পন্থীরা তাঁহার প্রতি বিরূপ। উঁহাদের বিরোধিতায় তিনি দ্বিতীয় বর্ষের কংগ্রেস সভাপতির কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। পরে তিনি বামপন্থীদের সহযোগে "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাগণের শীর্ষস্থানীয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি শত্রুদেশে গমন করেন ও বন্দী ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা ভারতীয় জাতীয়বাহিনী গঠন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি এরোপ্লেন ধ্বংশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

উদয়শঙ্কর—ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিবাস যশোহর জেলায় কালিয়া গ্রামে। উদয়শঙ্কর উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। জগৎবিখ্যাত রুশ নর্ত্তকী এনাপ্যাভলোভা ও লণ্ডনের "রয়েল কলেজ অব আর্টসে"র স্যার উলিয়াম রথেনষ্টীনের উপদেশ ও উৎসাহে তিনি ভারতীয় নৃত্যকলায় একটী "পৃথক স্কুল" উদ্ভাবনার স্বপ্ন দেখেন। অর্থহীন, সহায়হীন অবস্থায় সাধনা আরম্ভ করেন। প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে তাঁহার সাধনা ফলবতী হয়। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় নৃত্যকলা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজ "উদয়শঙ্কর" নামেই ভারতীয় নৃত্যকলার বিজয়বাণী ঘোষিত হয়। ভারতীয় নৃত্যকলার অনুশীলন জন্য সম্প্রতি তিনি আলমোরায় একটী নৃত্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা ও কবি-সম্রাট্

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী। "দীপনির্ব্বাণ", "হুগলীর ইমামবাড়ী" প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকা সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল। ইহার অনেকগুলি পুস্তক ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছে। ইনিই প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ঔপন্যাসিক। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, সন্দর্ভে, গানে, গল্পে, স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

অনুরূপা দেবী—ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মজঃফরপুর প্রবাসী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ইহার পুস্তকগুলি সর্ব্বজন আদৃত। 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। ইনি পিতামহের পদাঙ্কানুবর্ত্তী—ইহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাদিতে প্রাচীন সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সমর্থন থাকিলেও গোঁড়ামির কখনও প্রশ্রয় দেখা যায় না। সাময়িক পত্রিকায় ইহার বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি গৌহাটীতে "প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনের" ১৬শ অধিবেশনে মূল সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইন্দিরা দেবীও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী—কামিনী রায়—গিরীন্দ্রমোহিনী ২৪ পরগণা মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কবিতা ও কাব্যপুস্তক "অশ্রুকণা" প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্যপ্রতিভা দৃষ্ট হয়।

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে কামিনী রায় যে "আলো ছায়া" প্রণয়ন করেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া সর্ব্বদা গণ্য হইবে। তাঁহার "পুণ্ডরীক", "দীপ ও ধূপ" প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কবিতা ও কাব্যপুস্তক আছে। তাঁহার পিতা ছিলেন চণ্ডীচরণ সেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী ও ইংরাজ

বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, ইংরাজের আনুগত্য করিয়া বাঙ্গালী বড় হইয়াছে,—একটি অজ্ঞাতকুলপরিচয় জনসমষ্টিমাত্র বিজাতীয় পদলেহন করিয়া জাতি-পদবাচ্য হইয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। কথাটা কতদূর বিচারসহ তাহা পূর্ব্ব একাদশটি অধ্যায় পাঠে সম্যকভাবে বুঝা যাইবে। এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি বিভিন্ন দিক দিয়া আমরা ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভিন্ন এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করা। এই সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যস্থল ছিলেন মীরজাফর আর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েকজন ক্ষমতাশালী হিন্দু ও মুসলমান যাঁহাদের সিরাজের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আক্রোশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত কারণ ছিল। এরূপ ষড়যন্ত্রও অভূতপূর্ব্ব ছিল না। সিংহাসনের জন্য এই প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে সিরাজের মাতামহ আলীবর্দ্দী এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবাবই অল্পবিস্তর লিপ্ত থাকিতেন। এই ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে একথা কেহই বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহাদের বুঝিবারও শক্তি ও সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তখন জাতীয়তার জন্ম হয় নাই এবং ইংরাজও তাহার তীক্ষ্ণ রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে এদেশে দিবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই মুসলমান রাজ্য পতনের জন্য ইংরাজকে বাঙ্গালী বা বাঙ্গালী হিন্দুগণের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই। পরন্তু মোহনলাল, শ্যামসুন্দর, লালু হাজারী ও মিতন্‌লাল প্রভৃতি বাঙ্গালী হিন্দুর নবাবের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতাই উত্তরকালে সমগ্র বাঙ্গালীর ইংরাজ পল্টনে স্থানাভাবের কারণ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন ইংরাজ আমলেই হিন্দু জমিদারগণের উৎপত্তি। ইতিহাস সে কথাও স্বীকার করে না। ইংরাজ আমলে পুরাতন হিন্দু জমিদার উৎখাত হইয়া নূতনের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু মোটের উপর হিন্দু জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে (পৃঃ ৮৭) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"সৌভাগ্যের বিষয়, মুরশিদকুলী খাঁর সময়ের জমীদারী বন্দোবস্তের কাগজপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান। দেখা গিয়াছে, জমিদারী-বন্দোবস্তে বীরভূমি ভিন্ন প্রধান জমিদারী মাত্রেই হিন্দু-জমিদার। অন্যত্র মুসলমান তালুকদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; সমস্ত বঙ্গের এক আনা অংশমাত্র মুসলমান ভূস্বামীর হস্তে স্থাপিত ছিল"।

তৃতীয়তঃ, বলা হয় ইংরাজের আনুগত্য করিয়া বাঙ্গালী উচ্চ চাকুরীগুলি লাভ করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে। এই কথাটায় আংশিক সত্য থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। কালীপ্রসন্ন বাবু "বাংলার ইতিহাসে" এইরূপ লিখিয়াছেন—"স্বতন্ত্র পাঠান শাসনকাল হইতেই বঙ্গে উচ্চতর রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগ দৃষ্ট হয়। জেতা ও বিজেতার মধ্যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বিস্তারের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। আদর্শ নরপতি আকবরের শাসননীতি মুসলমানের হিন্দু প্রীতি বর্দ্ধন করে। ইচ্ছা থাকিলে বিজেতা মুসলমান সমগ্র রাজকার্য্য অন্ততঃ শাসনযন্ত্রের উচ্চতর অঙ্গগুলি মুসলমান হস্তেই পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাবগণ কখনও অত্যুদার নীতির অপব্যবহার করেন নাই। ভূপতি রায়, কিশোর রায় ও কানুনগো দর্পনারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে খালসা সেরেস্তায় প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। রঘুনন্দনই প্রথম খালসা দেওয়ান ও রায় রায়ান্। যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। সামরিক বিভাগেও লাহরি মল্ল ও দলিপ সিংহ সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রায় রায়ান্ আলম চাঁদ। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু নন্দলাল। জানকীরাম ছিলেন একজন বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী। তিনি পাটনার নায়েব-

নাজিম পর্য্যন্ত হ'ন। রায় রায়ান্ চিন্ময় রায়, বীরু দত্ত, কীর্ত্তিচাঁদ, অমৃত রায়, চিন্তামণি দাস, গোকুলচাঁদ—রাজস্ববিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। রাজবল্লভ নায়েব-সুবেদার হন। দৌত্য ও গুপ্তচরবিভাগে রাজারাম প্রভৃতিই প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদ, উমেদরাম প্রভৃতি উচ্চপদে ব্রতী ছিলেন। দুলভরাম, মানিকচাঁদ, মোহনলাল, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নতম পদের বাঙ্গালী হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। বক্সী, মুন্সী, মুস্তোফী, শিকদার, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যেই অধিকতর। মুস্তোফী ও খাসনবিসের পদ উচ্চ শ্রেণীর। তবেই দেখা গেল জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগে মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবগণ সভ্যজগতের আদর্শ স্থানীয়।"

অতএব দেখা যাইতেছে ইংরাজ আমলেই প্রথম বাঙ্গালী উচ্চপদে আরূঢ় হন নাই। বরং ইংরাজের প্রথম আমলে উচ্চপদগুলি ভারতীয়দের একেবারেই লভ্য ছিল না। মোগল আমলে বাঙ্গালীরা বহু উচ্চপদ পাইয়াছিল কিন্তু যোগ্যতার পরিমাণে ততদূর সুবিধা করিতে পারে নাই যেহেতু বাঙ্গালী পারস্য ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বর্জ্জন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও স্বজাতীয় কৃষ্টির (বৈষ্ণব) সাধনা করিয়াছিল।

চতুর্থতঃ, অনেকে বলেন ইংরাজ আনুগত্যে বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে সারা ভারতবর্ষে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের নিকট প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, মাত্র অংশিকভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে। "বাঙ্গালীর উপনিবেশ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি মুসলমান-পূর্ব্ব যুগেই বাঙ্গালী ভরতের বাহিরে ব্যবসা, বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মুসলমান-যুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তিও লাভ করেন। এই সময়কার মথুরাঞ্চল, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি উলেখযোগ্য। জয়পুরে বিদ্যাধরের খ্যাতি

ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ ও বিন্দুসরোবর খনন, ও পুরীর অসংখ্য কীর্ত্তি বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচায়ক। বৃন্দাবনধাম ও কাশীধামের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার বাঙ্গালীরই ধর্ম্ম ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয়। বৃন্দাবনে সুবুদ্ধি বাঙ্গালী গোস্বামীগণই ভারতসম্রাট্ মহামতি আকবরকে শূন্যপদে ও পদব্রজে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় আনিয়া দেবমন্দিরগুলি দেখাইয়া তাঁহার সহানুভূতি ও সাহায্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালীরা ভারতের সুদূর প্রান্তেও ইংরাজের দপ্তরখানায় বহুসংখ্যক চাকুরী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সব চাকুরিয়ার অধিকাংশই কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসী, পূর্ব্ববঙ্গের অতি অল্প কৃতবিদ্য লোককে আমরা বঙ্গের বাহিরে সেকালে দেখিতে পাই। ইহার কারণ হইতেছে কলিকাতা ইংরাজ-স্থাপিত প্রথম, বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সহর। এই খানেই প্রথম অর্থকরী বিদ্যার প্রসার লাভ হয় যাহার ফলে মসীজীবি কেরাণীকুল দ্রুত সৃষ্ট হয়। অধিকন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই মসীজীবি ছিলেন, অধিকাংশই সুশিক্ষিত ও স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন—যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টার, উকিল, ব্যারিষ্টার, সংবাদপত্র সম্পাদক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষার ফলে বাঙ্গালীর বহু অনিষ্টও হইয়াছিল। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে বাঙ্গালীরা কেরাণীগিরি করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিত, সেজন্য ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেরা পিতৃপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকুরী গ্রহণ করিতে ও শিক্ষিত ব্যবসা, যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। ফলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত ব্যবসা ও আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, রাজপুতের হাতে চলিয়া গেল।

মাত্র ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে বড়বাজার বাঙ্গালীর ব্যবসাকেন্দ্র ছিল আজ তাহা মাড়োয়ারীর আবাসকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালী যে বড় হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ তাহার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। এ স্বাচ্ছল্য ইংরাজ যুগের দান নহে। অনাদিকাল হইতে বাঙ্গালা-দেশ ভারতের দ্বারস্বরূপ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বৈদেশিক আক্রমণ আসিতে পারে, কিন্তু বৈদেশিক সম্পদ ও সভ্যতা চিরদিনই সমুদ্রপথে আসিয়াছে। বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, গৌড় প্রভৃতি স্থানে বৈদেশিক বণিক তাদের জাতীয় কৃষ্টি ও পণ্যসম্ভার লইয়া ব্যবসা করিতে আসিত। ইংরাজ যুগের প্রথমেও ব্যবসা বাণিজ্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দিদিগের হাতে ছিল। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী হইল বাঙ্গালী চাকুরীর মোহে ব্যবসা ছাড়িয়া জঠরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজ যুগে বাঙ্গালীর উত্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ সেইটাই যাহা আর একদিন এই বাঙ্গালীকেই গৌড়রাজ গণেশ ও হুসেন শাহের রাজত্বকালে পঙ্গুত্ব ও মূকত্ব বর্জ্জিত করিয়া পটুত্ব ও প্রগলভ করিয়াছিল। যেমন সেদিন সুদীর্ঘকাল-নির্জ্জিত হিন্দু-বাকশক্তি অবসর পাইয়া বাধাহীন তটিনীর মত দুকুল প্লাবিয়া রায়মুকুট বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন প্রমুখ শাস্ত্রকার-গণের দেবকণ্ঠে স্ফুট হইয়া বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালীকে স্পন্দিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ ইংরাজ যখন প্রায় সাত শত বৎসর পরে বঙ্গে তথা ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ও ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল তখন আর একবার বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ধীশক্তি ও দেহের কর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠিল—বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিল অতি অল্পকাল মধ্যে এমন সব শক্তিধর মনীষী যাঁহারা যে কোন জাতির ও দেশের পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের কারণ হইতে পারেন—যথা ধর্ম্মজগতে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবসেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণ, শ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি;

সাহিত্যাকাশে ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, হেম, নবীন, ভূদেব, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি, রাজনৈতিক গগনে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশ বন্দোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ; প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ; সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চ্চায় রাধাকান্তদেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রভৃতি।

এই নবযুগের মূলে ছিল বাঙ্গালী মনের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন ভাব। এই বাঙ্গালাদেশ যেমন একদিন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী কপিলের সাংখ্যদর্শনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে হারবার্ট স্পেন্সার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির প্রগতিমূলক চিন্তাধারা বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইহারই ফলে বাঙ্গালা ভারতের চিন্তা নির্দ্দেশক হইয়াছিল। মহামতি গোখেল বলিয়াছিলেন, "আজ বাঙ্গালা যাহা ভাবে, পরের দিনে ভারতবর্ষ সেই ভাবধারা গ্রহণ করে।" বাঙ্গালী ভাবের ঘরে কখনও চুরি করে নাই। নূতন ভাবধারাকে নিজস্ব চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবার অপরাজেয় শক্তি বাঙ্গালীর চিরদিনই আছে। ইহাই বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে।

অতএব বলা যাইতে পারে ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী কেবলমাত্র তাহার যোগ্যতার পুরস্কার পাইয়াছিল। বাঙ্গালী মস্তিষ্ক বহুকাল যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল, ইংরাজ আমলের শান্তি ও শৃঙ্খলা সেই সুযোগের পথ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, কেহ বলেন সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙ্গালী ইংরাজের আনুগত্য করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে। যে "সিপাহী-যুদ্ধের" ইতিহাস লেখক রজনী গুপ্ত

তাঁহার পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে, সিপাহীরা বিনা কারণে ইংরাজ আশ্রিত নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর প্রথম হইতেই অত্যাচার আরম্ভ করে। বাঙ্গালীরা এ সময়ে ইংরাজদের কোন সাহায্যে না আসিলেও কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। সুখের বিষয় সেই নির্জ্জিত বাঙ্গালীদের সে সময় রক্ষা করিয়াছিল তাঁহাদের প্রতিবেশী ও সিপাহীদিগের স্ব-প্রদেশীয় প্রধান ব্যক্তিরা। বলা বাহুল্য, ভিন্ন প্রদেশীয়েরা বাঙ্গালীর সৌভাগ্যে ইতিপূর্ব্বেই ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই ঈর্ষা প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করিয়াছিল। কাজেই আত্মরক্ষা-তৎপর বাঙ্গালীদের ইংরাজের সহচর ও সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। "লড়ে টোপীওয়ালা, খায় ধূতীওয়ালা" হিন্দুস্থানের এই প্রবাদ বাক্যটি তাহার প্রমাণ। ইংরাজ বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতাকে তারিফ করিত, তাহার বিশ্বস্ততাকে শ্রদ্ধা করিত, অসময়ে তাহার বুদ্ধির সাহায্য লইত এবং সুসময়ে সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বিস্মৃত হইত না। পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হইলে ইংরাজও বাঙ্গালীর এই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ, ভারতে জাতীয়তামূলক সাহিত্যের স্রষ্টাই বাঙ্গালী। হেমচন্দ্রের "ভারতবিলাপ", রঙ্গলালের "পদ্মিনী", নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ", বঙ্কিমের "আনন্দমঠ", রজনীকান্তের "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" যখন লেখা হইয়াছে তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ঘন তিমিরাবৃত। জাতীয়তার বীজও তখন অন্য কোন প্রদেশে অঙ্কুরিত দূরে থাকুক উপ্তও হয় নাই।

সপ্তমতঃ, ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার দুইটি বিষয়ে বিশেষ অবনতি হইয়াছে। বাঙ্গালীর জন্মভূমি রেলের প্রাদুর্ভাব হেতু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বাঙ্গালী স্বাস্থ্যসম্পদহীন হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালীরা সামরিক এমন কি পুলিস বিভাগেও প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু একদিন এই বাঙ্গালীর বাহুবলের সাহায্যেই ইংরাজ কলিকাতা দুর্গ উদ্ধার করিয়াছিল এবং পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। ইংরাজের "লাল পল্টন" ছিল বাঙ্গালী সৈন্য দ্বারা

গঠিত। "বাঙ্গালীর বল" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এবিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। বৰ্দ্ধমানের শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় ২।১ মাস মধ্যে লক্ষাধিক বাঙ্গালী যোদ্ধা বিদ্রোহীদের সহিত জুটিয়াছিল। আর ইংরাজ আমলে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসকে ব্রেজিলে গিয়া ভাগ্য অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। এমন কি মহাযুদ্ধের সময়েও বাঙ্গালী পল্টনের সৈনিকেরা যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য মধ্যে বিরল বলিয়া দেখা গিয়াছে।

অষ্টমতঃ, মুসলমান ধৰ্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচারের ফলে মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালীজাতির উন্নতির বাধা ও বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সেই ভুলে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থে ও সামর্থে যে বৈষম্য সূচিত হইয়াছে তাহার ফলে আমরা আজ সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায়।

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার চিন্তাধারা—ইংরাজ আমলে বাঙ্গালার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই ইংরাজ আগমনে বাঙ্গালায় যে যুগান্তর আসে তাহার প্রথমপাদে আমরা মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা আক্রান্ত হই। সে যুগের শিক্ষক হইলেন ডিরোজিও ও তাঁহার ভক্ত ছাত্রবৃন্দ। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা যখন খালি চিন্তায় নয় ধৰ্ম্ম ব্যাপারেও পরিস্ফুট হইল তখন এই যুগান্তরের দ্বিতীয়পাদে রামমোহন প্রভৃতি শাস্ত্রের নূতনরূপ ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া নবীনের সহিত জগা-খিচুড়ী পাকাইয়া তাহাকে একটি স্বতন্ত্ররূপ দিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা (ব্রাহ্মধৰ্ম্ম) যখন সাধারণ্যে সমাদৃত হইল না তখন প্রাচীনকেই সুসংস্কৃত ও নববেশে সজ্জিত করা হইল; এই বেশবিন্যাস সংগৃহি হইল য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যাহা শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহাই আত্মসাৎ করিয়া। যুগান্তরের এই তৃতীয়পাদে এ কার্য্যে প্রধান ঋত্বিক হইলেন ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম। তারপর যুগান্তরের চতুর্থপাদে আসিল—রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী যুগ—চিন্তায়,

আচারে, ব্যবহারে, সমাজবিধানে, নৈতিক জীবনে। এখন আমরা পঞ্চমপাদে উপনীত—এ যুগে একদিকে শুনিতে পাইতেছি বুভুক্ষুর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন—মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর হা হুতাশ ও কৃষাণ-শ্রমিক-মজদুর চাঞ্চল্য, অন্যদিকে শুনিতে পাই প্রগতির প্রাণপূর্ণ আস্ফালন—সহশিক্ষা, ছাত্র-আন্দোলন, স্বেচ্ছা বিবাহ ইত্যাদি। চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সামাজিকগণের বর্ত্তমান দায়িত্ব হইতেছে কি করিয়া সমাজ জীবনে এই বিদ্রোহী মতগুলি ক্রমে ক্রমে সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রগতি জীবধর্ম্ম, মানবের জীবনবেদ। স্থাণু, পঙ্গু, বিকল ইহাদের জগতে স্থান নাই। ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি জীবনের স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রগতি বলিলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন। উহার প্রধান কারণ হইতেছে কতকগুলি তথাকথিত প্রগতিবাদীর অশিষ্ট আচরণ। প্রগতি অর্থে বুঝিতে হইবে জীবনকে পণ করিয়া, বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া ন্যায়ধর্ম্ম ও বিনয়-পরিপাটী (discipline) রূপ কবচে রক্ষিত হইয়া, সত্য সুন্দর ও শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তপঃসাধনা। অজ্ঞতা, জড়তা, কৃত্রিমতা, রক্ষণশীলতা ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে বিদ্যাবত্তা, জীবনীশক্তির স্পন্দন, পবিত্রতা, উদারনীতি ও সুনিশ্চয়তার যে বিজয় অভিযান তাহাই প্রকৃত প্রগতি।

এই প্রগতিবাদী তরুণ বা তরুণী হইবে নম্র অথচ দৃঢ়চেতা, উন্নতি-বিলাসী অথচ ঈর্ষাহীন, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা অথচ অহিংস, কৌশলী অথচ সত্যাশ্রয়ী, তেজস্বী অথচ সংযমী ও বিচারবুদ্ধিপরায়ণ অথচ আত্মস্থ। আহারে ও বিহারে, বেশ ও ভূষায়, বাক্যে ও আলাপে সংযমই হইবে তাহার চিরভূষণ। বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে ইহারাই হইবে আমাদের আশার আলোক, দুর্দ্দিনের বন্ধু, বিপদে সহায় ও মরণের সাথী।

এই যে বাঙ্গালী তরুণ, যাহার আগমনের আশায় আমরা স্নেহময় হৃদয়ের প্রতি কন্দরে সুখময় আসন বিছাইয়া বসিয়া আছি, দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলস সস্নেহে পাতিয়াছি, যাঁহার আবাহনে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা লইয়া যুগ-যুগান্তর হইতে উদ্‌গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছি,—সেই তরুণ, সেই বাঙ্গালীর আশা ভরসার স্থল, বাঙ্গালার শোকদুঃখাপহারী তরুণ,—যদি সেই চিরবাঞ্ছিতধন উদয় হয় স্খলিতপদে, জড়িত নয়নে, শক্তিহীন বাহুতে, অসংলগ্ন

বেশে, ভাষাহীন কণ্ঠে,—তাহা হইলে কাহার শ্লাঘায় ও গৌরবে সুনীল-জলধি-সুতা রবিকরহর্ষোজ্জ্বলা মলয়জশীতলা, সুজলা সুফলা শ্যামা বঙ্গভূমি তাঁহার শির উন্নত রাখিবেন? তাই আমরা চাই তরুণের বিজয় অভিযান। এ তরুণ তরুণের ব্যভিচার মাত্র হইলে চলিবে না—কাব্‌লি-কচ্ছ, বেলুচি-গালপট্য, নট-কল্পিত-বাস-শোভিত, পরিদৃশ্যমান অন্তর্ব্বাস পরিহিত, চার্লী গুম্ফ অনুকারী, বেশ-সর্ব্বস্ব, মেরুদণ্ডহীন, ক্ষীণবুদ্ধি, উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসর্ব্বস্ব বিলাসী যুবকের প্রেতাত্মা হইলে চলিবে না।

বাঙ্গালীর আজ এক হিসাবে মহাদুর্দ্দিন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহিত বাঙ্গালী-বর্জ্জনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। এ মনোভাবের পশ্চাতে আছে প্রতিযোগিতা পরাঙ্মুখতা। প্রাদেশিকতা জাতীয়তার একান্ত পরিপন্থী। তথাপি সংখ্যাবলে সে সব প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেও গণমত বলিয়া জাতীয়তার নামে অনাচার কিছু কিছু চলিতেছে। এখন বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভিন্ন প্রদেশবাসীর—ভয়কে ভক্তিতে, ঈর্ষাকে শ্রদ্ধাতে, ঘৃণাকে প্রীতিতে এবং রাগকে অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে। ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, কণ্ট্রাক্টরী, শিল্প-বাণিজ্যাদি স্বাধীন ব্যবসায়ে যে সকল বাঙ্গালী ভিন্ন প্রদেশে লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা, অমায়িকতা, সেবা, সমাজ-উন্নয়ন-ব্রত গ্রহণ ও প্রীতি অনুশীলন দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেক সহরে বাঙ্গালীরা ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেন, এখন তাঁহাদিগকে সেই দেশবাসীর সুখদুঃখের ভাগী হইতে হইবে, সামাজিকভাবে তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে এবং তাঁহাদের উন্নতিকর ও মঙ্গলকর সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতে হইবে।* স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ঘৃণা করিলে চলিবে না।

---

* দ্বাদশ বৎসর হইল একদা আগ্রা হইতে ফিরিবার পথে একজন অবাঙ্গালীর সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। এমন সময় গাড়ী যখন যুক্তপ্রদেশের

ইহা ছাড়া, শ্রম ও চেষ্টার দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। সুখের বিষয়, প্রবাসী বাঙ্গালীরা সকল প্রতিযোগী পরীক্ষায়ই, এমন কি খাস বাঙ্গালাদেশের প্রতিযোগী ছাত্রগণ অপেক্ষাও, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। আজও নূতন নূতন প্রদেশে বাঙ্গালীর নবীন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। এই সেদিন বোম্বাই সহরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা নূতন "এংলো-বেঙ্গলী" বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

ফাফুন্দ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল তখন প্রায় এক মাইল দূর হইতে একটি বিরাট জয়ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ট্রেণ যখন সুদীর্ঘ প্লাটফরমে প্রবেশ করিল তখন দেখা গেল জনসমুদ্রে সমস্ত ষ্টেশন ভরিয়া গিয়াছে, তিল মাত্র স্থান নাই! ষ্টেসনের পশ্চাতেও বিপুল জনসমাগম দেখা গেল। জনতার বৈচিত্র ছিল এই, যাবতীয় স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা এবং বহু সবলকায় বিরাটবপু পুরুষমানুষও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর বিদায় অভিনন্দনে এইরূপ জনসমুদ্র দেখা যাইতে পারে কিন্তু এইরূপ আন্তরিক শোকপ্রকাশ অদৃষ্টপূর্ব্ব। বহুক্ষণ ট্রেণ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবার পর কদলীবৃক্ষ ও গাঁদা ফুলের মালার দ্বারা একটি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষদ্বার সুসজ্জিত হইল। তাহার পর সেই সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের কি বিরাট চঞ্চলতা, কি হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ। প্লাটফরমে এমন একটিও বাঙ্গালী দেখা গেল না যে ঘটনার বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারে, এদিকে এমন একটি হিন্দুস্থানীয় নাই যে ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিয়া ঘটনা বর্ণনা করিতে পারে। অবশেষে দূর হইতে দেখা গেল মিলের লাল পাড় সাড়ী পরিহিতা গৃহস্থ ঘরের প্রসাধন বর্জ্জিতা একটি মধ্যবয়স্কা বাঙ্গালী রমণী ১০।১২ বৎসর বয়স্ক একটি বালকের হস্ত ধারণ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। দুই পার্শ্বের যাহারা পারিতেছে তাহারাই তাঁহার পদধূলি লইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে সেই বিক্ষুব্ধ বিরাট জনতা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতেছে। এ নারী ত শ্রীমতী কস্তুরী বাইও নহেন, সরোজিনী নাইডুও নহেন, তবে ইনি কে? এমন সময় লম্বা কোট ও ধুতী পরিহিত একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে সেই পত্রপুষ্প-সজ্জিত গাড়ীখানিতে উঠিতে দেখা গেল। তিনি আর কেহ নহেন এই ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক, বহুদিন এখানে ছিলেন, এখন গয়াতে বদলী হচ্চেন। অবশেষে ট্রেণ ছাড়িলে সমস্ত জনতা এই ভদ্রলোকটিকে একবার শেষবারের মত দেখিবার জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তারপর বালক বৃদ্ধ নাই, স্ত্রী পুরুষ নাই, ইতর ভদ্র নাই, সকলে মনের ব্যথায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। Accidentএর ভয়ে express

বাঙ্গালীর আর একটি ভাবিবার কথা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ যদি এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালীর রাজনীতি ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ও শিক্ষা জগতে, নিঃসন্দেহে অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ ঘটিত। সত্যই বাঙ্গালী অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। কর্ম্মী জীবনগুলির অপচয় জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। ইংরাজের এক পুরুষ যাইতে না যাইতে আমাদের তিন পুরুষ গত হইতেছে।

বাঙ্গালাদেশ দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত—হিন্দু ও মুসলমান। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইলেও (সংখ্যা ২ কোটি ৫৪ লক্ষ, অমুসলমান ২ কোটী ২১ লক্ষ), বিদ্যায়, অর্থে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে হিন্দুরা অধিক অগ্রসর। এই তারতম্যই সাম্প্রদায়িকতা বুদ্ধির সৃজনকারী। আমাদিগকে এই পার্থক্য দূরীভূত করিয়া বঙ্গমাতার দুইটি বাহুই সমান সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে যেখানে ৭ জন হিন্দুর বাস সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৮ জন, প্রতি জন হিন্দু চাষীর স্থানে মুসলমান চাষীর সংখ্যা ৫ জন। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে দেখা যায় যেখানে ৯জন হিন্দু পুরুষ ও ছয় জন হিন্দু স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে সেখানে যথাক্রমে চারিজন মুসলমান পুরুষ ও ১জন মুসলমান নারী লিখিতে পড়িতে জানে। মাধ্যমিক শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত যথাক্রমে ২৮ ও ৫ এবং কলেজিয় উচ্চ শিক্ষায় ২৫ ও ৪। ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে অনুপাত ৫ ও ১ এবং

---

train প্রায় পাঁচ মিনিটকাল ধরিয়া ধীরগতিতে প্লাটফরম পার হইল। এ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান শক্ত। পরে শুনা গেল মিষ্টার রায় বহুদিন এখানে ছিলেন এবং নানা প্রকার উপকার দ্বারা লোকের এত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার আশু বিদায়ে আত্মীয় বিয়োগরূপ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা এক্ষেত্রে স্থান পায় নাই। মিষ্টার রায়ের ন্যায় বাঙ্গালীই আবার ভারতে বাঙ্গালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবেন। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর নমস্য।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনুপাত ১৩ ও ১। অতএব দেখা যায় মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারলাভ আশু প্রয়োজন। কয়েকটি মোটা বৃত্তি দ্বারা কয়েকটি শিক্ষিত পরিবারের যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ "তেলা মাথায় তেল দেওয়া" ব্যবস্থা না করিয়া সমগ্র সম্প্রদায় মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার করা প্রয়োজন। ধীমান ও বুদ্ধিমান বালক যেমন ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ দরিদ্রের কুটিরেও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আর এই দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ টির উপর। আরও একটি বিশেষ ভাবিবার কথা শুধু হিন্দু মুসলমানের মিলন আমাদের সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণ হিতসাধন করিতে পারিবে না, যদি না হিন্দু তৎপূর্ব্বেই তাহার নিজ সমাজেও স্বাস্থ্যকর সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে পারে। অস্পৃশ্যবাদ অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং অস্পৃশ্য জীবনের মালিন্য ও সঙ্কোচ দূর করিয়া সমাজ জীবনে তাহার সম্যক স্থান ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

শিক্ষার প্রসার লাভ হইলে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের যে অশেষ মঙ্গল ঘটিবে শুধু তাহাই নহে 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও লোপ পাইবে—সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য চলিতে থাকিলে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়েই অধঃপাতে যাইবে, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার মস্তক নত হইয়া পড়িবে।

বাঙ্গালীর স্বাধীন-চিত্ততা একটি বহু প্রাচীন সংস্কার। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু ইহা যদি সমষ্টিগত কর্ম্মশক্তির পরিপন্থী হয় তাহা হইলে তাহা জাতির অবনতির কারণ হয়। আমাদের ব্যক্তিত্বাভিমান আমরা এত বাড়াইয়া তুলি যে কাহারও সহিত আমরা একত্রে বেশীদিন কাজ করিতে পারি না—এক দল বহুদলে বিভক্ত হয়, প্রতি দলে উপদলের সৃষ্টি হয়। আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে, সমাজ বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে এই ভেদ প্রবৃত্তি এত প্রবল যে আমরা জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া দল ও উপদল-

গত স্বার্থ লইয়া গৃহবিচ্ছেদ ঘনীভুত করিয়া তুলি। কিন্তু এই চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ববাদই বাঙ্গালীকে একদিন ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিল। একমাত্র বিনয়-পরিপাটীই (discipline) ইহার প্রতিকারের উপায়।

এই কলহ প্রবৃত্তি হইতে সামাজিক জীবনে ঈর্ষা ও দ্বেষ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে আমরা পরাঙ্মুখ, ব্যক্তিগত গ্লানি ও নিন্দা প্রচার হইয়াছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের মূলধন এবং সামাজিক জীবনে প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাসীর শত্রুভাবে ও গ্রাম্য দলাদলি হইয়াছে আমাদের অঙ্গের ভূষণ। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই হীন মনোভাব সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে বাঙ্গলা একদিন নেতার পর নেতা সৃষ্টি করিয়াছে, আজ সেখানেই যে নেতৃত্বাভাবে হইয়াছে তাহার এক মাত্র কারণ এই ঈর্ষা প্রণোদিত কলহ-কোলাহল ও গ্লানিপ্রচার। যে বাঙ্গালীর স্বদেশের প্রতি একটুও মায়া মমতা আছে তাঁহাকে এই দলগত-প্রাণ কলহপরায়ণ ব্যক্তিগণ হইতে মাত্র অবজ্ঞাভবে দূরে থাকিলে চলিবে না, পরন্তু এই স্বার্থসর্ব্বস্ব দেশদ্রোহীগণকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া হয় জাতীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি, অতএব সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত যোগ রাখিয়া উচ্চাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাস্তবতার মধ্যে নগ্ন ও ঘৃণ্য যাহা আছে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, যাহা সত্য ও সুন্দর তাহার পূজা একান্ত কর্ত্তব্য। পাপীকে ঘৃণা করিবে না সত্য কিন্তু পাপকে এমন ভাবে ঘৃণা করা উচিৎ যাহাতে কেহ পাপী হইতে না চায়। বর্ত্তমানকালে লেখকের অভাব নাই বটে কিন্তু সমালোচকের অভাব বিশিষ্টভাবে অনুভূত হইতেছে। অধিকন্তু যে দেশে সাহিত্য কেবল যৌন আলোচনায় পরিণত হয়,—কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি উপেক্ষিত হয়, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ছাত্র আন্দোলন দেশে শুরু হইয়াছে। উহাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে এবং সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার শাসনে সুশৃঙ্খলিত করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দিতে হইবে। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রের হাতেই থাকা উচিত, কারণ জাতীয় জীবনে অচিরেই তাহাদিগকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষেও সংযত সেনানী জীবন যাপন করিতে হইবে।

বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে, তজ্জন্য আর্থিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশে যে একশত কোটী টাকার পাট উৎপন্ন হইত তাহা কাহারা আত্মসাৎ করিতেছে? আমরা যখন দুই একটি সরকারী চাকুরী লইয়া মাথা কাটাকাটি করিতেছি তখন আমাদের ধান্য, গম, পাট, চা, তামাক, গুড়, চিনি, তৈল বীজ, বনজ দ্রব্যাদি, ফলমূল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভ কাহারা ভোগ করিতেছে? এই সব ব্যবসায়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসা বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে উৎপাদিকা শক্তিও সহজেই দ্বিগুণ, চতুর্গুণ হইতে পারে। আধুনিক উপায়ে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা আর্থিক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগীতায় বাঙ্গালীর মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেইজন্য বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক, লোন আফিস প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আশু প্রয়োজনীয়। বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ আমাদের কোন প্রকার ন্যায্য সুবিধা দিতেই রাজী নহে। পরন্তু স্বজাতির তুলনায় আমাদের সহিত সর্ব্বদাই ব্যবহার-বৈষম্য করিতে পশ্চাৎপদ নহে। স্বদেশীয় ধনিকের বিরুদ্ধে অভিযান বর্ত্তমানে আত্মঘাতী হইবে কারণ বাঙ্গালায় এখনও ভারতীয় ধনিকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

বর্ত্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রকারে অর্থকরী। এই ব্যবসার প্রধান মূলধন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়। বাঙ্গালীর এই মূলধনের একান্ত অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ উচ্চাঙ্গের জীবনধারণ প্রথা (High Standard of Comfort), এই ধৈর্য্যহীনতার প্রধান কারণ। বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া (ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি প্রভৃতি), আমাদের

অধ্যবসায়বিহীন হইবার ও শ্রমবিমুখ হইবার প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজরোষও বাঙ্গালার অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ত্রাসবাদ-দলন-নীতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থাগুলি বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আবেষ্টনীকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। বাঙ্গালার জন্যই "Communal Award" এর সৃষ্টি, ইহা হিন্দু মুসলমানে এবং হিন্দুতে হিন্দুতে বৈরিভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তারাও বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে সমদুঃখীভাবাপন্ন হন নাই। অন্ততঃপক্ষেও তাঁহারা জাতীয়তাবাদী-গণের ভিতরেও ঈর্ষাদ্বেষ, কলহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু পরিমাণে লাঘব করিয়া আশার আলোক জ্বালিতে পারিতেন।

অতএব আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালার মুক্তি বাঙ্গালীর হাতে। নিজ পায়ে বাঙ্গালীকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বাঙ্গালী তরুণকে প্রকৃত প্রগতিবাদী হইতে হইবে, শ্রম ও কর্ম্ম, সেবা ও ত্যাগের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে, বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করিতে হইবে, স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে, স্বজাতিয়ের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে, অস্পৃশ্যতা পাপের শান্তি করিতে হইবে, সাহিত্যের আদর্শ উন্নত করিতে হইবে, নিয়মানু-বর্ত্তী, সংযমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, আর্থিক ব্যবহারের উন্নতি করিতে হইবে, অতিমাত্রার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং ছাত্র সংগঠন কার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে। এক কথায় বাঙ্গালীকে নীতি ও ধর্ম্মবলে, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতি

(১) সংস্কৃতির ধারা

সভ্যতার ক্রম—সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তন পথে দেখা যায় মানব প্রথম "শীকারজীবি" (hunting stage) ছিল। তাহার পর "পশুপালন" দ্বারা (pastoral stage) জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখিল। পরবর্ত্তী তৃতীয় পর্য্যায়ে "কৃষিকার্য্য" (agricultural stage) অবলম্বন করিয়া সভ্যতার উন্নত স্তরে আরোহণ করে। সভ্যতার শেষ পর্য্যায় হইতেছে পৌর-প্রধান ব্যবস্থায় "যন্ত্র-শিল্প" সাহায্যে উৎপাদন (manufacturing stage)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সভ্যতাকে কৃষিমূলক চতুর্থ স্তরের সভ্যতাকে পৌর-প্রধান সংস্কৃতি বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে কৃষিমূলক সংস্কৃতির শেষ পর্য্যায় সম্প্রতি আসন্ন হইলেও পৌর-প্রধান সংস্কৃতি বলিলে যাহা বুঝায় সে যুগ এখনও ব্যাপকভাবে মুর্ত্তিগ্রহণ করে নাই।

ভারতীয় সভ্যতার ক্রম বিবর্ত্তন—(ক) ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা 'প্রাচীন' প্রস্তর যুগ ও 'নবীন' প্রস্তরযুগ (পৃঃ ২)। তারপর আসে তাম্রযুগ এবং অবশেষে লৌহযুগ। অন্যান্য দেশের ন্যায় 'ব্রোঞ্জযুগ' ভারতে দেখা দেয় নাই বলিয়া মনে হয়। এই সকল আদি যুগের আদিম মানব 'শীকারজীবি' ছিল এবং তাহাদের জীবিকার একটা অস্পষ্ট আভাষ পাইলেও, এই যুগের সামাজিক জীবনের রূপ সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সম্ভবতঃ জানিবারও বিশেষ কিছু নাই। এই যুগে (ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে) বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূলে ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ ঊর্ণাবৎ কেশযুক্ত মানুষ বাস করিত, তাহাদের "নিগ্রোবটু" জাতীয়

বলা হইত। আন্দামানে, মাদ্রাজের আন্নামালাই পর্ব্বতে, আসামে নাগাদের মধ্যে ও রাজমহলের বাগ্দীদের মধ্যে ইহাদের অবশেষ রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

(খ) ভাষাতত্ত্ব (philology), পুরাতত্ত্ব (archœlogy), জাতিতত্ত্ব (ethnology) ও নরতত্ত্ব (anthropology) প্রভৃতি বিজ্ঞান সাহায্যে মানুষের লুপ্ত প্রাচীন কুলুজি বাহির করা যায়। আমরা এখন প্রথমে ভাষাতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করিব। ইহার সাহায্যে ভারতে আমরা পাঁচটি জাতির অস্তিত্বের সংবাদ পাই। যথা, নিগ্রোবটু, অষ্ট্রীক, দ্রাবিড়, আর্য্য ও ভোটচীন। নিগ্রোবটু সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় হইতেছে—**অষ্ট্রীক**—কোল, ভীল প্রভৃতি 'আদিবাসী', আসামের খাসিয়া জাতি প্রভৃতি ইহাদের বংশধর। ইহারা সম্ভবতঃ 'ইন্দোচীন' হইতে আসামের পথে ভারতে আসে। ইহারা মাটির জালায় মৃতের দেহাবশেষ রক্ষা করিত এবং মৃতের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে দিত (পৃঃ ১৮)। ইহারাই প্রথম কৃষিকার্য্য প্রচলন করে। তীক্ষ্ণ মুখ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা ইহারা ভূমি কর্ষণ করিত। ইহাদের ধারণা ছিল যে দেহান্তে মানুষের আত্মা গাছ, পাহাড় ও অন্যান্য জীবজন্তুর ভিতর প্রবেশ করে—সম্ভবতঃ এই ধারণাই পরবর্ত্তীযুগে হিন্দুর জন্মান্তরবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি। আষ্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—"ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন ও সংহতি শক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল—এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই"।

তৃতীয় জাতিটি হইতেছে **দ্রাবিড়জাতি** (পৃঃ ১৮)। হরপ্পা-মহেঞ্জো

দড়ো সম্ভবতঃ ইহাদের কীর্ত্তি চিহ্ন। এতদিন ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা যে জাতিতত্ত্ব খাড়া করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারমূলে পুরাতত্ত্ব তাহার সাহায্যকারী হইয়াছে।

হরপ্পার জন্ম ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্ব হইতে পারে—মহেঞ্জো-দড়ো তাহার পরবর্ত্তী যুগের। হরপ্পার শবাশেষ পরীক্ষা করিয়া অবিমিশ্রিত নূতন কোন জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই—ওখানে বর্ত্তমানের ভারতীয় প্রধান প্রধান জাতির দেহাবশেষ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবহার্য্য পাত্রাদিতে সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়। আর কৃষি সভ্যতার পৌর পর্য্যায়ের পরিচায়ক প্রকাণ্ড 'ধর্ম্মগোলা' ও সুপরিকল্পিত 'শ্রমিক পল্লীর' বিন্যাস দেখা যায়। তামা গলাইবার চুল্লী, সুদক্ষ হস্তে নির্ম্মিত নগ্নমূর্ত্তি, সোনা, রূপা, পাথর, কড়ি প্রভৃতির অলঙ্কার দেখিলে বেশ বুঝা যায় কৃষিসভ্যতা সেই উন্নততর স্তরে পৌছিয়াছে যখন কারুশিল্প যথেষ্ট উন্নতিরপথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামাজিক জীবনের অধিক কোন বৃত্তান্ত বুঝা যায় না। মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কারগুলি পৌর সভ্যতার পথে আরও কিছু অগ্রসর। গম যব, প্রভৃতি কৃষিপণ্য ছাড়া আরসি, চিরুণী, অলঙ্কার, মুদ্রায় খচিত প্রাণীচিত্র প্রভৃতি উন্নত জীবনযাত্রার প্রসাধন দেখিতে পাওয়া যায়। যোগীমূর্ত্তি, আদি দেবীমূর্ত্তি, লিঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি নিদর্শন "প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সুমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্য সাগর ও এশিয়ান সভ্যতার সহিত এই সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ সূচিত করে।"

ঋগ্বেদে দেখা যায় যে আর্য্যরা ভারতে আসিয়া এইরূপ একটী জাতীর দেখা পাইল "যাহারা পাষাণ দুর্গে বাস করিত, যাহাদের পুরী লৌহ প্রাচীরে ঘেরা থাকিত, পুরীর একশটা পর্য্যন্ত দ্বার থাকিত, যাহাদের শরীর নানারূপ সোনা ও মূল্যবান পাথরে ঝলমল করিত, যাহাদের দুর্গ সোনা রূপা ও লোহার সাজসজ্জায় শোভা পাইত, যাহারা ধনু, বর্শা, বল্লম, ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিত।" সম্ভবতঃ ইহারাই দ্রাবিড় জাতি।

(ঘ) তারপর আসিল খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ। ইহারা আনিল নূতন যুদ্ধাস্ত্র—অশ্ব। এই যাযাবর জাতির আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল উন্নতর সভ্যতায় পুষ্ট দ্রাবিড় গৃহস্থ-জীবন। আর্য্যজাতি রাষ্ট্র বিজয়ের সহিত পরাজিত জাতির সংস্কৃতি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া সভ্যতার এক ধাপ উচ্চে উঠিল।

তাহাদের সামাজিক জীবনও অনেকখানি উন্নত হইল। এই বৈদিকযুগে প্রজা-সমিতি করিত রাজনির্ব্বাচন। মৃতদাহ, সহমরণ, যৌবন-বিবাহ, স্বেচ্ছা বিবাহ, নারীর ও পুরুষের বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমাজিক রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। 'নিস্ক' নামে সোনার চাকৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইলেও গরু বিনিময়ে বেচা কেনা চলিত। শিল্পী গহনা গড়িত, কাঠের বাড়ি, রথ চাষবাসের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিত। মেয়েরা সূতা কাটিত, কাপড় ও ঘাসের মাদুর বুনিত। কন্যা বরের ও নিজের বিবাহের কাপড় নিজে বুনিত। ভেড়ার লোমে পোষাক বোনা হইত। পানার্থে সোমরসের খুব প্রচলন ছিল। সাধারণ লোকে সুরাপান করিত। নগর বেশী ছিল না, গ্রামগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। পুর অর্থে সুরক্ষিত দুর্গ বুঝাইত। মানুষের আয়ু শত-শরৎ দীর্ঘ হউক—প্রার্থিত হইত। আহারাদিতে কোন বাদ সাদ ছিল না, ষাঁড়ের মাংস উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বেদ মুখস্থ ছাড়া লিখিতও হইত, মানুষের অক্ষর জ্ঞান ছিল। বণিকরা জাহাজযোগে বাণিজ্য করিত, চিকিৎসা বিদ্যা খুব উন্নত হইয়াছিল। বড় রাজার উপাধি হইত 'সম্রাট', তাহার নীচে 'রাজা', তাহার নীচে 'রাজক', তাহার নীচে যিনি তাঁহার উপাধি ছিল 'পুরপতি'। ঘোড়দৌড়, গীতবাদ্য, পাশাখেলা, নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতির চর্চ্চা খুব প্রচলিত ছিল। সপরিবারে যজ্ঞ করার বিধি ছিল এবং যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইত। ধনীলোকে বিরাট রকমের যজ্ঞ করিত। ধর্ম্মমন্দির বা ঠাকুরের বিগ্রহ না থাকিলেও বৈদিক দেবতার সাহায্য সর্ব্বকার্য্যে প্রার্থিত হইত এবং তাঁহাদের পূজা ও স্মরণ লওয়া হইত। ইন্দ্র ও সূর্য্য

ছিলেন প্রধান উপাস্য দেবতা। যমুনাতীর বাসী কৃষ্ণকে বৈদিক ঋষিরা তুচ্ছ করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ভাগবতে দেখা যায় ইন্দ্র পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ একমাত্র পূজনীয় ঠাকুর রূপে অর্চ্চনা পাইতেছেন।

কিন্তু হিন্দুসভ্যতার মূল এই বেদে একটী জিনিষ দেখা যায় যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যদিও তখন শ্রমবিভাগ হইয়াছে তথাপি জাতির ও জাতি-ভেদের উদ্ভব হয় নাই। ব্রাহ্মণ তখন জাতি পদবাচ্য নহে, শ্রেণী মাত্র। তাঁহাদের উপাধি ছিল ঋষি, তাঁহারা ছিলেন যজ্ঞ কার্য্যের হোতা এবং ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক। পরে ইঁহারাই ব্রাহ্মণ হন এবং আর্য্য বা হিন্দুসমাজকে এমনভাবে বন্ধন করেন যাহা ৩।৪ হাজার বৎসরের বহু ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব ও সমাজের শক্তি ব্যাহত বা লুপ্ত করিতে পারে নাই।

(ঙ) সুজলা সুফলা ভারতের অধিপতি হইয়া ক্রমশঃ আর্য্যরা অন্নচিন্তার ঊর্দ্ধে উঠিয়া **পরমাত্ম চিন্তায়** রত হইল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ রচিত হইল। অমৃতের পিপাসা জাগিয়া উঠিল। অনিত্য মায়াময় বাস্তব ছাড়িয়া, সত্য শিব সুন্দরের পশ্চাতে জীবন বিমুখ অতৃপ্ত তৃষ্ণা সুতীব্র হইয়া উঠিল। অপরদিকে একদল আর্য্য কর্ম্মকাণ্ড পদ্ধতি জোরে আঁকড়াইয়া রহিল। শেষোক্ত দলই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিল—পরাবিদ্যা ও স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার পরাজয় ঘটিল।

(চ) কর্ম্মকাণ্ড বিশ্বাসী আর্য্য বা হিন্দুধর্ম্ম ঋষি বা ব্রাহ্মণ দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল—উহাকে আমরা **নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম** বলিতে পারি। চিন্তা-শীল আধ্যাত্মবাদী আর্য্যগণ উত্তর ভারত হইতে পূর্ব্ব ভারতে তাড়িত হইল। কপিলের সাংখ্যতত্ত্ব হইল তাহাদের জীবন বেদ। মহাভারতের যুগেও এই সংঘর্ষ দেখিতে পাই। পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা জরাসন্ধের নেতৃত্বে—নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

(ছ) **ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ: নব্য ব্রাহ্মণ্য**—এদিকে সংখ্যা-বৃদ্ধিহেতু আর্য্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইতেছিল। আর্য্য-স্রোত

মগধে পৌছিয়া বিষম বাধা পাইল পূর্ব্বদিক হইতে। আর্য্যগণ ইতিমধ্যে চারিটি জাতি বা বর্ণ গঠন করিয়া ফেলিয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। উহার মধ্যে ত্যাগে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণগণ শীঘ্রই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী জাতিগুলিকে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগকে দাবাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর হইল। পরশুরামের একবিংশতিবার ভারতকে নিঃক্ষত্রিয়করণ উহার একটি উদাহরণ মাত্র। অপর দিকে ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণকেও সুচক্ষে দেখিতে পারিল না। ফলে যে সংগ্রাম সুরু হইল তাহার পরিণামে ক্ষত্রিয়ের অবনতি ও ব্রাহ্মণের বিপুল শক্তি সঞ্চয় হইল। এই শক্তি সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া যায় রাষ্ট্রের ইতিহাসে। পৌরাণিক যুগে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে আমরা দেখিতে পাই যে এক একটি করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী আর্য্য বা অনার্য্য রাজা নিহত বা পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব, বঙ্গরাজ, তাম্রলিপ্তরাজ, নরক, মুর, ভগদত্ত, বাণ ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত নব্য ব্রাহ্মণ্যের শত্রু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রযোজনায় ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস আমরা দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক যুগে দেখি নন্দবংশ স্থাপয়িতা মহাপদ্ম শূদ্রানী গর্ভজাত এবং পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় নিসূদনকারী। তৎপর ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশীয়। কিন্তু নব্য ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার কার্য্যে এতদূর অসমীচীন হইয়া পড়িলেন যে আপামর জনসাধারণ মধ্যে বিক্ষোভ ধুমাইত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি অবশিষ্ট বর্ণগুলির বিশেষতঃ শেষ দুইটীর বিরোধিতা ক্রমশঃ রূপ গ্রহণ করিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য জৈন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পৌত্র মহারাজ অশোক ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও রাজকীয় অবদানে উহার অমর বোধন সমাপন করিলেন।

(জ) **বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ম**—বৌদ্ধধর্ম্ম বিপ্লবী-ধর্ম্মরূপে উদিত হইল—জাতি-লাঞ্ছিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সম্মুখে এক কেন্দ্রাভিমুখী, এক সত্তাবিশিষ্ট ও এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রেণী

বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া জনসমাজের দাবী স্বীকার করিল বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশাধিকার ঘোষিত হইল। জনসাধারণ বুদ্ধরূপী সামাজিক মুক্তিদাতাকে ক্রমশঃ দেবতার আসনে বসাইল। প্রথমে তাঁহার পদদ্বয় অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে করিতে তাঁহার বহুপ্রকার মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইল। কালক্রমে পরবর্ত্তী অষ্টশত বৎসরে বৌদ্ধ সমাজে এতগুলি সামাজিক দুর্নীতি প্রবেশ করিল যে তাহা সংযত অথচ কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

(ঝ) **নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ শক্তিসঞ্চয়**—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আবার প্রাবল্য লাভ করিল। মৌর্য্যবংশ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গবংশ স্থাপন করিলেন। সুঙ্গবংশ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণমন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ববংশ স্থাপন করিলেন। এই যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তীব্র বিরোধ চলিতে থাকে। এই যুগের বাঙ্গালাদেশের সামাজিক ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে নব্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অল্পে অল্পে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিলেও জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম তখন যে ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বাঙ্গালাদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। বুদ্ধদেব বাঙ্গালার সীমানায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও জৈনধর্ম্মের তীর্থঙ্করদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেতগিরি) নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

(ঞ) **গুপ্তবংশ ও বাঙ্গালায় নব্য ব্রাহ্মণ্যের প্রসার**—চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের সহিত আবার বাঙ্গালায় হিন্দু-সংস্কৃতির পত্তন হয়।* গুপ্তবংশ বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ

---

* "গুপ্তযুগে পুরাণ ও শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইল। সত্যই গুপ্তযুগ সদাচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগ। এই আভিজাত্য সূচিত হয় কয়টি দানে—প্রথমতঃ আত্মসংযমে, দ্বিতীয়তঃ অহিংসায়, তৃতীয়তঃ পরম সহিষ্ণুতায়, চতুর্থতঃ সত্যানুসন্ধিতায়। সমগ্র হিন্দু সংস্কৃতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্য চেতনা, উহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরও ভিত্তি। নিম্নশ্রেণীও ইহার শাসনতাই স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়া—মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই তাহার আপন সার্থকতা। মোটের উপর ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম।" কিন্তু এই সংস্কৃতিতে উৎপাদকদলের কোন মর্য্যাদা ছিল না—তাহারা শূদ্র ও অন্ত্যজ রহিয়া গেল।

করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বংশের পরাক্রমশীল সম্রাট মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের তীব্র বিরোধীতা করিয়াছিলেন।

(ট) **পালযুগ ও বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার**—তাহার পর আসে বাঙ্গালী পালরাজগণ। তাঁহারা ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত দৃঢ় হস্তে সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী ছিলেন না। পালযুগে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়।

(ঠ) **সেনযুগ—বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা**—পালবংশের পর বাঙ্গালায় আসে সেনবংশ। তাঁহারা ছিলেন হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপালক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুরস্কগণ কর্তৃক বাঙ্গালা আক্রান্ত হইলে সেন সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে গমন করে।

(ড) তারপর আসিল **মুসলমান বিজয়**। এতদিন বিজেতারা বিজিতের সংস্কৃতির নিকট পরাজয় মানিয়া ভারত দেহে এক হইয়া গিয়াছিল। এবার ভারতীয় সংস্কৃতি ধারার পরাজয় হইল—ইস্‌লামের রাষ্ট্রশক্তির নিকট নয়, তাহার উগ্রতার নিকট। এবার আর বিজেতেরা আষ্ট্রিক, দ্রাবিড় বা আর্য্যগণের ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া গেল না।

(২) বাংলার সামাজিক ব্যবস্থা

(ক) ব্রাহ্মণ—রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক

খ্রীঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতকেও বঙ্গভূমি বেদাচার বহির্ভূত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। মহাভারতাদিতে উক্ত আছে অসুররাজ বলির পাঁচপুত্রের নাম হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ দেশের নামকরণ হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ের অসুররাজ বাণ, নরকাসুর, মুর প্রভৃতি পূর্ব্বদেশীয় রাজগণকে অসুর বলিয়া উল্লেখ করায় বুঝা যায় তাহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী

ছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে পুণ্ড্র ও সুহ্মে জৈনধর্ম্মের প্রাবল্য এবং পরবর্ত্তী কালে মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার লাভ হইতে ভালভাবেই বুঝা যায় বৈদিক ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইতে বিশেষ বাধা পাইয়াছিল।

ভাণ্ডারকারের মতে আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে—বেদানুমোদিত ধর্ম্ম সমগ্র-ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। তাম্র-শাসন, শিলালিপি ও প্রাচীনগ্রন্থসমূহ হইতে অনুমান করা যায় যে গুপ্তযুগ হইতে (পঞ্চম শতাব্দী হইতে) দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বেদচর্চ্চার বাহুল্য হইয়াছিল। বহু তাম্রশাসনে দেখা যায় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণও কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ গৌড় ও বরেন্দ্রভূমে বাস করিত। শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্ক্কারি, রাঢ়ে অবস্থিত সিদ্ধল, কোটিবর্ষ প্রভৃতি স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। প্রখ্যাত বাঙ্গালী বেদভাষ্যকার-গণের মধ্যে গুগড়াচার্য্য, ভট্ট গুরবমিশ্র, ভট্ট গুণবিষ্ণু, হলায়ুধভট্ট, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তথাপি বাঙ্গালীর বেদে অজ্ঞতার জন্য ভিন্ন প্রদেশবাসীকে দোষারোপ করিতে দেখা যায়। উহার প্রধান কারণ বাঙ্গালী না বুঝিয়া বেদ মুখস্থ করিত না। যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র ব্যাখ্যা করিয়া লইত। বেদাধ্যয়ন ও উদ্‌গীরণ বাঙ্গালাদেশে কখনও বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। এই জন্য বাঙ্গালায় বেদাধ্যয়ন লোপ পাইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হয়। বোধ হয় এই কারণেই রাজা পুষ্যমিত্র একবার মগধে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, এবং পরে গৌড়েশ্বর আদিশূর ৭৩২ খ্রীঃ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। রাজা শ্যামলবর্ম্মাও একই কারণে ১০৭৯ খ্রীঃ কনৌজ নিবাসী পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনয়ন করেন। আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালায় যে সকল ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে বাজসনের শাখাবলম্বী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের বাহুল্যই বেশী। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা যে তাম্র-

শাসনের দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহাতেও যে ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ১১৬ জনই যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ।

বেদস্তোতা ঋষিগণই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হ'ন। বৈদিকযুগে এবং তাহার পরেও যেমন বহু ব্রাহ্মণ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন তেমনি ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। উত্তরকালে ঋষিসন্তানগণ যাঁহার যে ঋষিবংশে জন্ম, নিজ পরিচয় দিবার সময় তিনি সেই ঋষির নাম উল্লেখ করিতেন। এইরূপে "গোত্রের" সৃষ্টি হয়। আদি গোত্রকার ৭ জন ঋষির নাম উল্লেখ হয়, পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০০ বিভিন্ন গোত্র-নাম দেখা যায়। কিন্তু একাধিক ঋষির এক নাম থাকায় গোত্র উল্লেখ দ্বারা পরিচয় প্রদানে অসুবিধা হইতে থাকায় "প্রবরের" (প্রবর অর্থে ঋষিপুত্র) উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ পৃথক পৃথক প্রবররূপ ভেদবোধক বিশেষণ দ্বারা তাঁহাদের বিভক্ত করা হয়। যজ্ঞ-হোমাদির জন্য আর্য্যরা ধেনু পালন করিতেন। সেজন্য প্রত্যেক ঋষির আশ্রমের নিকট গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঋষির পুত্রগণ ও শিষ্যেরা উহা রক্ষা করিত। সেজন্য গোচারণ ভূমির নাম রাখেন "গোত্র" (অর্থাৎ যাহা দ্বারা গো রক্ষা হয়)। আর্য্য ঋষিরা সমাজ রক্ষার্থে সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন।

বাঙ্গালায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্ব একেবারে ত্যাগ না করিলেও বৌদ্ধদের অনুকরণে পৌরাণিক দেবপূজায় ও উহাদের আচার অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হন। এইরূপ অবস্থায় আনুমানিক ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর আদিশূর পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের জন্য কান্যকুব্জ হইতে (আধুনিক ফতেগড় জেলার অন্তর্গত) পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তৎকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ সংখ্যা ৭০০ শত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কেহ কেহ বলেন "সারস্বত" হইতে এই "সপ্তশতী" কথার উৎপত্তি।

আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাসের জন্য বীরভূম, মানভূম,

বর্দ্ধমান, সিংহভূম ও বাঁকুড়া জেলায় পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। পরে আদিশূরের প্রপৌত্র ক্ষিতিশূর উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয় বংশধরগণকে ৫৬ খানি গ্রাম ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণকে একশত খানি গ্রাম দান করেন। এই সকল গ্রামের নামানুসারে "গ্রামী" বা চলিত কথায় "গাঞি" শব্দের উৎপত্তি হয়। "গাঞি"র নামের অল্পাধিক অপভ্রংশ হইতে উপাধির উৎপত্তির কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল :

গাঞি		উপাধি	গাঞি		উপাধি
গড়গড়	=	গড়গড়ী	কাঞ্জ	=	কাঞ্জিলাল
পর্কট	=	পাকড়াশী	গাঙ্গল	=	গাঙ্গুলী
মাস	=	মাসচটক	ঘোষ	=	ঘোষাল
বড়া	=	বটব্যাল	গুড়া	=	গুড়

রাঢ়ীয় ৫৬ গাঞি (৫৯ ?) ৫টি গোত্রে বিভক্ত যথা—শাণ্ডিল্য (বন্দ্যঘাটী প্রভৃতি ১৬ গাঁই), ভরদ্বাজ (মুখৈটি প্রভৃতি ৪ গাঁই), কাশ্যপ (চট্য প্রভৃতি ১৬ গাঁই), সাবর্ণ (গাঙ্গুলী প্রভৃতি ১২ গাঁই), ও বাৎস্য (ঘোষাল প্রভৃতি ১১ গাঁই)।

বারেন্দ্র ১০০ গাঞি ৫টি গোত্রে বিভক্ত, যথা—শাণ্ডিল্য (লাহিড়ি প্রভৃতি ১৪ গাঁই), ভরদ্বাজ (ভাদুড়ি প্রভৃতি ২২ গাঁই), কাশ্যপ (মৈত্র প্রভৃতি ১৮ গাঁই), সাবর্ণ (শ্রীঙ্গি প্রভৃতি ১৯ গাঁই) এবং বাৎস্য (সান্ন্যাল প্রভৃতি ২৪ গাঁই)।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে বলা হয় যে বর্ম্মণ রাজা শ্যামলবর্ম্মা কান্যকুব্জ অথবা কাশী হইতে বেদপারগ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনিয়া স্থাপন করেন। পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "পাশ্চাত্য" আখ্যা দেওয়া হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আর একটি অংশ দ্রাবিড় ও উৎকল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করায় তাঁহাদিগকে "দাক্ষিণাত্য" বৈদিক বলা হয়।

কৌলিন্য প্রথা—যে সময় গাঞি নির্দ্দিষ্ট হয় তখন সকল ব্রাহ্মণই "শ্রোত্রীয়" নামে অভিহিত হইতেন। 'সপ্তশতীরা' সাধারণ "শ্রোত্রীয়", ও গাঞিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণরা "সচ্ছোত্রিয়" এবং "কুলাচল" এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। রাজা বল্লালসেন সিংহাসনারোহণ করিয়া যখন দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ সমাজে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছে তখন সমাজ রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। তখন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী পঞ্চদশ পুরুষ অবধি পৌছিয়াছে। তিনি 'নবলক্ষণাক্রান্ত' বিপ্রগণকে "মুখ্য" কুলীন ও নবগুণের স্বল্পভাবাপন্ন বিপ্রগণকে "গৌণ" কুলীন আখ্যা দেন। নবগুণ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেন—"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্। নিষ্ঠা শান্তি (আবৃত্তি) স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্"। রাঢ়ীয়-গণের ৫৬ গাঞির মধ্যে ৩৪ ঘরকে বল্লাল 'শ্রোত্রীয়' ধার্য্য করেন, অবশিষ্ট ২২ ঘর "কুলাচলে"র মধ্যে ১৯ জনকে 'মুখ্য' কুলীন ও ১৪ জনকে 'গৌণ' কুলীন ধার্য্য করেন। কুলীন শ্রোত্রীয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না। বল্লাল নিজ প্রবর্ত্তিত বিধি সঞ্জীবিত রাখিতে স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনকে আদেশ করেন। লক্ষ্মণসেন কুলীনগণের ১ম ও ২য় সমীকরণ করেন। শুদ্র দানগ্রহণকারী বিপ্রগণের "রব কুলীন" আখ্যা হয়। সেনবংশীয় দনুজমাধব ও কেশবের সময় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণ হয়। পরবর্ত্তীকালে কুললক্ষণের ব্যবস্থা ঘটকগণের হাতে আসে। বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে কুলাচার্য্য-গণের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ষাকল্পে শতাধিকবার কুলীনগণের সমীকরণ করেন। মুসলমানদিগের সময়, হিন্দুদের সামাজিক বিবাদ মীমাংসার জন্য কয়েকটি 'জাতি-মালা' কাছারী ছিল এবং দত্তখাস নামে কোনও মুসলমান-রাজের প্রধান মন্ত্রী এই জাতি-মালা কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু পরে দেবীবর ঘটক (১৪৫৯ খ্রীঃ) রাঢীয় কুলীনগণের মধ্যে মেলবন্ধন করেন। রাজা বল্লালসেনের স্থাপিত ব্যবস্থাদি পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন করেন। তার

পরিণামে কুলীন সমাজে বহু বিবাহ, শিশুকন্যা বিবাহ, মুমূর্ষুর সহিত বিবাহ প্রভৃতি কুরীতি প্রচলিত হয়। 'মেল' প্রচলনের শতবর্ষের মধ্যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রাক্তন নানা বিধি ধর্ম্মহানিকর বলিয়া ব্যবস্থা দেন। তাঁহার ব্যবস্থায় সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

(খ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

জীমূতবাহন, ভবদেব ভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির উল্লেখ থাকিলেও, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির বিশেষ কোন বংশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতিরেকে অন্য বর্ণ লুপ্ত দেখা যায়। বৌদ্ধযুগে ও তাহার পরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী ও তাহার পরবর্ত্তীকালে হীনগতিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর। মহাভারতে পুণ্ড্ররাজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পদবী পাইয়াছেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের সহিত, বাঙ্গালায় হিন্দু ধর্ম্ম পঙ্গু হইয়া পড়ে। আদিশূরের সময় সমগ্র বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা পাওয়া যায় মাত্র সাত শত। বেণ ও পৃথুর কাহিনী হইতে বুঝা যায় বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয় বিরাট সংখ্যায় শুদ্ধি সংস্কারের দ্বারা। এই সংস্কৃত জনগণ শূদ্ররূপেই সমাজ দেহে গৃহিত হয়।

(গ) কায়স্থ, বৈদ্য

করণ জাতি প্রাচীন বঙ্গের একটি প্রধান জাতি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে করণ জাতির উল্লেখ আছে। এই করণ জাতিই পরবর্ত্তী কালের কায়স্থ জাতি। বিষ্ণু পুরাণে ও অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর অনুশাসনে কায়স্থ জাতি রাজকীয় লিপিকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে কায়স্থ জাতি বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় কাগজপত্রে রাজকর্ম্মচারিগণের উপাধি মধ্যে, "প্রথম বা জ্যেষ্ঠ

কায়স্থের" উল্লেখ হইতে মনে হয় যে তখনও কায়স্থ শব্দ উপাধিবাচক ছিল, জাতিবাচক হয় নাই। দশম শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কায়স্থ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কুলজীর মতে আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চ শূদ্র পরিচারক হইতে কায়স্থগণের উৎপত্তি। ভাণ্ডারকার বলেন পঞ্জাবের নাগরকোট নামক স্থান হইতে বাঙ্গালার কায়স্থরা আগমন করিয়াছেন এবং উহারা নাগরকোট ব্রাহ্মণ-গণের বংশধর যেহেতু তাঁহাদের ন্যায় উহাদের উপাধি মধ্যে দেখা যায় দত্ত, ঘোষ, বর্ম্মণ, নাগ এবং মিত্র প্রভৃতি পদবী। বাৎসায়নের কামসূত্রে বঙ্গদেশে নাগর ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইতে এই কাহিনী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে "নাগর ব্রাহ্মণ" শব্দটি ভুল পাঠ মাত্র উহা "নগর ব্রাহ্মণ" হওয়া সম্ভব, এবং সেকালে উপরোক্ত পদবীগুলি বাঙ্গালা ছাড়া সমগ্র ভারতেই ব্যবহৃত হইত।

বৈদ্য জাতিরও প্রাচীন বঙ্গে তেমন প্রতিপত্তির কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্মৃতিগ্রন্থে বৈদ্যজাতির কোন উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ও বৈশ্য-মাতার গর্ভে একটি শঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে। তাহাদিগের পদবী ছিল "অম্বষ্ঠ" এবং মনু বলেন চিকিৎসা বিদ্যা ছিল তাঁহাদের জীবিকা। কুলুজি অনুসারে আদিশূর এবং সেন রাজারা অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য। কিন্তু ইতিহাসের মতে তাহা সত্য নহে।

(ঘ) কৈবর্ত্ত—মাহিষ্য

মনু বলেন কৈবর্ত্তগণ দাসবংশীয় এবং তাহারা নৌজীবি। জাতক অনুসারে ধীবর ও কৈবর্ত্ত একই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে যে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভে কৈবর্ত্ত জাতির জন্ম। কলিযুগে ধীবর বা মৎস্য-জীবির সংস্পর্শে তাহাদের অধোগতি হইয়াছে। স্মৃতিতে ক্ষত্রিয় পিতা ও

বৈশ্য মাতার গর্ভে মাহিষ্য জাতির জন্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্যগণ (হালিকা দাস ও পরাসর দাস) মেদিনীপুর জেলার চাষী কৈবর্ত্ত-দিগের সহিত এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হন। উঁহাদের মধ্যে বহু জমিদার ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছেন। পালযুগ হইতে ইঁহারা সমাজে সম্ভ্রমের অধিকারী হন। পুরাণ, মনুসংহিতা, জাতক প্রভৃতিতে কৈবর্ত্তগণকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, চাষী কৈবর্ত্ত ও মৎস্যজীবি কৈবর্ত্ত। চাষী কৈবর্ত্ত পরবর্ত্তী-কালে মাহিষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ধীবর কৈবর্ত্তরা সম্ভবতঃ কোন নিম্নশ্রেণীর আদিম অধিবাসী, পরে কৈবর্ত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। বল্লাল চরিতে কথিত আছে যে বল্লালসেন কৈবর্ত্তগণের সামাজিক উন্নতি বিধান করিয়া জল আচরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ("বাঙ্গালার ইতিহাস"—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।

(ঙ) শঙ্কর জাতি

ইহা ছাড়া বঙ্গদেশে বহু শঙ্কর ও শঙ্করাৎসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের পরিচয় দেওয়া গেল।

ব্রাহ্মণ পিতা— ক্ষত্রিয় মাতা—(অপসদ)—কুম্ভকার, তন্তুবায়।
বৈশ্যা মাতা ,, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
শুদ্র মাতা ,, বারুজী।

ক্ষত্রিয় পিতা— ব্রাহ্মণী মাতা—মালাকার, সূত (রথচালক)
তাম্বুলি (পানরোপয়িতা), তৈলী
(তিলি বা তেলী)
বৈশ্যা মাতা—(অপসদ)—উগ্রক্ষত্রিয়।
শুদ্রা মাতা ,, নাপিত, মোদক।

শুদ্র পিতা— ব্রাহ্মণী মাতা— চণ্ডাল।
ক্ষত্রীয়া মাতা— কর্ম্মকার, দাসকৈবর্ত্ত।
বৈশ্যা মাতা— গন্ধবণিক, কাংশবণিক, শঙ্খবণিক।

নবশায়ক— তিলি, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোহালী (বারুই), কামার, কুমার, পুটুলি, এই নবশাকাবলী।

বৈশ্যা মাতা—করণ পিতা (নৌকাবাহক)—তক্ষা (ছুতার), রজক।

অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) পিতা—স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক।

গোপ ,, আভীর, তৈলকার (কলু)।

স্বর্ণকার ,, মালগ্রাহী (মেথর)।

স্বর্ণ বণিক ,, কুড়ব (আবর্জ্জনাবাহী)।

আভীর ,, চর্ম্মকার।

(৩) ধর্ম্ম পরিচয়

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। তখন বঙ্গ অনার্য্যভূমি বা দস্যুভূমি। রামায়ণ মহাভারতের সময় হইতে বাঙ্গালার আর্য্যবাস আরম্ভ হইয়াছে—পরশুরাম মহাস্থানে তপস্যা করেন এবং বঙ্গে "লোহিত্য তীর্থ" স্থাপন করেন। পরে মহাভারতীয় যুগে পুণ্ড্রদেশে ক্ষত্রিয় রাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ সংবাদ পাই না। এই যুগে একদিকে বাঙ্গালায় হিন্দু তীর্থের উল্লেখ পাই—যেখানে উত্তর ভারতীয় হিন্দুর যাতায়াতের বাধা নিষেধ ছিল না, অন্যদিকে জৈন (নিগ্রন্থপুত্র) ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। ভদ্রবাহু, বর্দ্ধমান স্বামী প্রভৃতি জৈন শ্রুতিকেবলী ও তীর্থঙ্করগণ বাঙ্গালাদেশে এবং তন্নিকটবর্ত্তী পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেতগিরি) তপস্যা ও দেহরক্ষা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন ও বৌদ্ধযুগ চলিতে থাকে। পরে পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগের আরম্ভে বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম কতক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় পৌরাণিক দেবতা, যথা ইন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "কুমার" বা "স্কন্দ" (কার্ত্তিকেয়) পূজা প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাকার "শিব"

পূজাও প্রচলন হয়। এই শিব পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধের আসনে বসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তিরোধানে সাহায্য করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম পালযুগে (৮ম হইতে ১০ম শতাব্দী) বিশেষ প্রসার লাভ করে। কিন্তু ক্রমশঃ উহাতে অনাচার প্রবেশ করিতে থাকে। বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকগুলি মত প্রতিষ্ঠালাভ করে, যথা মহাযান, হীনযান, সর্ব্বাস্তিবাদ, সমতটীয়বাদ, ইত্যাদি। ইহার পর আসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ—যথা সরোরুহ, লুইপাদ প্রভৃতি ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মে যোগমার্গ ও গুরুবাদ প্রকট হইয়া উঠে। যোগ (হঠযোগ) হইতে শারীর-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়। ফলে ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ বিস্মৃত হইয়া বিধি ও অবিদ্যা প্রাধান্য পায়। এইরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ তন্ত্র অত্যন্ত হীনতা ও ব্যভি-চার প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে শক্তি আরাধনা ক্রমশঃ বৌদ্ধমণ্ডলে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু তান্ত্রিকেরা ও শাক্তরা বৌদ্ধ তন্ত্রের ও শাক্ত উপাসনার সারগুলি গ্রহণ করিয়া এমনভাবে নিজেদের ধর্ম্ম মধ্যে উহা গ্রহণ করে যে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। এই যুগকে বাঙ্গালার তান্ত্রিকযুগ বলে। হিন্দু তান্ত্রিকরা বৌদ্ধতন্ত্রের সারভাগ আত্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বৌদ্ধ দেবদেবী পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে লইয়া আসেন। তারা দেবী, এমন কি দেবী সরস্বতী পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ দৈবী ছিলেন।

সিদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশাবলি হইতে "নাথ" ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। সিদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশাবলি গ্রহণে অবধূতগণের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করিলেও চলিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি হইল "সহজিয়া", "বাউল" প্রভৃতির। চণ্ডীদাসের গানে সহজিয়াদের মতামত আমরা জানিতে পারি। ইহাদের ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্ম বজ্রযানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাউলদিগের ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধ 'সহযান' মতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখনও বুদ্ধদেব "ধর্ম্মঠাকুর"রূপে প্রচ্ছন্নভাবে পূজা পাইতেছেন। নেড়া-

নেড়ীর দল (বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনী), বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব শ্রেণী মধ্যে গৃহীত হওয়ায় তাহাদের ঘৃণ্য জীবন লোপ পাইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে প্রাধান্য পাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ তাদের আরাধ্য। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবধারা। বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতবর্ষে আপামরকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাধাকৃষ্ণ প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়। চৈতন্য আনিলেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বন্যা। তাহার মধ্যে সহজিয়া ভাব কতকটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

(৪) জাতি-তত্ত্ব পরিচয়

বঙ্গের আদি অনার্য্য অধিবাসিদিগকে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'নিষাদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের পর আসে দ্রাবিড় ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীরা (পৃঃ ১৪)। অধ্যাপক মহলানবিস্ নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, (১) কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত্ত বাংলার নিজস্ব জাতি, (২) বাংলার উচ্চ জাতিগুলির সহিত ব্রাহ্মণদের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ, (৩) অন্যান্য জাতিগুলির অপেক্ষা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্জাবীদের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ইহা হইতে মনে হয় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত অন্যান্য উপজাতির রক্তের সংমিশ্রণ অবাধভাবে চলিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে বিদেশাগত ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যই সূচিত হয়।

নরতাত্ত্বিকরা মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া বলেন বাঙ্গালীরা বৈদিক আর্য্য-শাখা হইতে উৎপন্ন নহে। রিজ্‌লী সাহেবের মতে বাঙ্গালী দ্রাবিড়ীয় ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামীর ও টাকলামাকান মরুভূমি হইতে ইন্দ-যুরোপীয় ভাষাভাষি আলপাইন জাতীয় লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করে। ইহারা আসিয়া দেখে গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগ আর্য্যরা অধিকার করিয়া লইয়াছে, সেজন্য তাহারা নিম্ন